৪ এপ্রিল ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

□ রঙিন পোস্টার : অ্যালান বর্ডার
□ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গোয়েন্দা-উপন্যাস

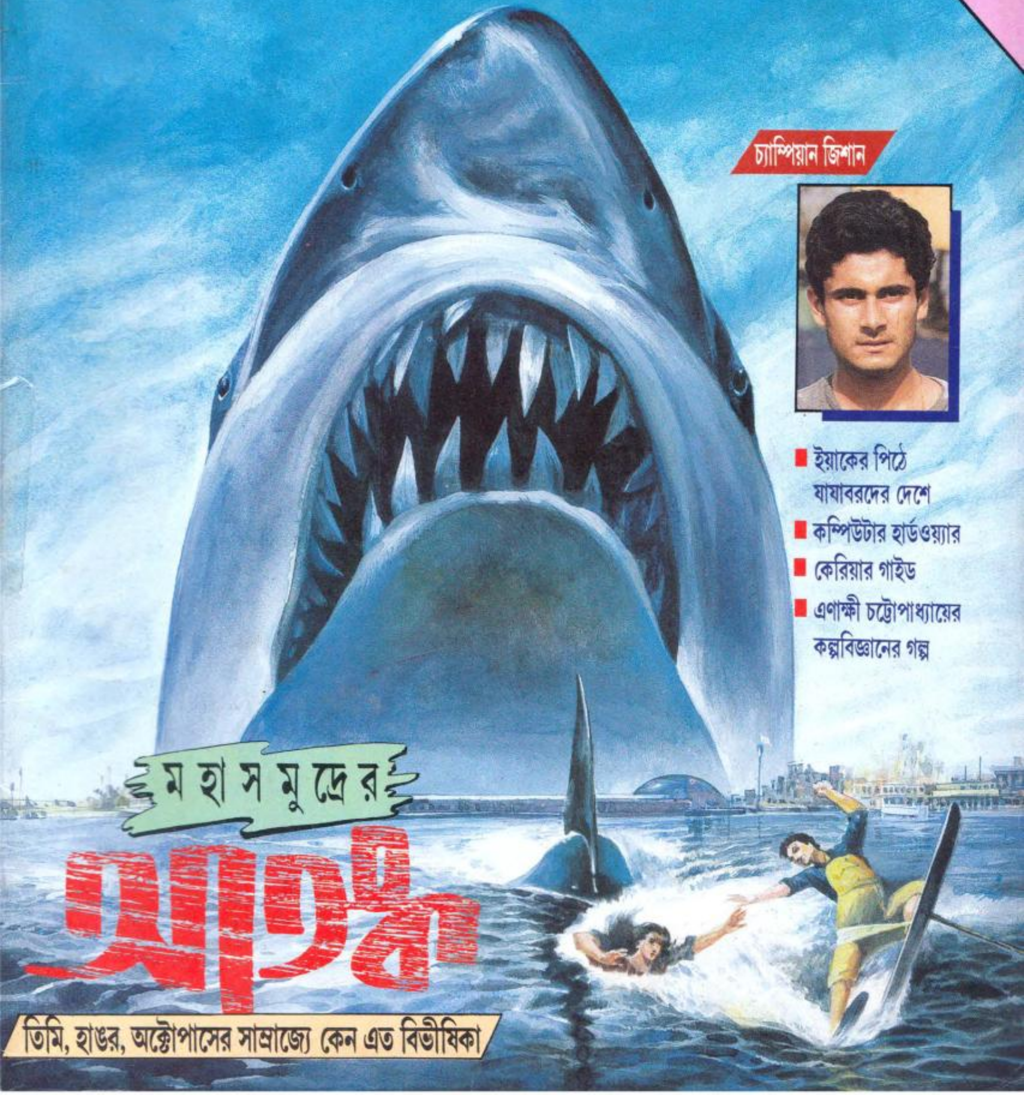

চ্যাম্পিয়ান জিশান

- ইয়াকের পিঠে যাযাবরদের দেশে
- কম্পিউটার হার্ডওয়্যার
- কেরিয়ার গাইড
- এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের কল্পবিজ্ঞানের গল্প

মহাসমুদ্রের আতঙ্ক

তিমি, হাঙর, অক্টোপাসের সাম্রাজ্যে কেন এত বিভীষিকা

এক চামচ যোয়ানের আরকের গুণে...

কাল রাতে ভরপেট নেমন্তন্ন খেয়েও খোকনের পেটের গোলমাল হয় নি... তাই ইস্কুলও কামাই হ'ল না !

পেটের গোলমালের জন্য খোকনের কখনও স্কুল কামাই হয় না। কারণ, পেটের গোলমাল, বদহজম, অম্বল, পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেঁকুর, বুকজ্বালা ··· সব কিছুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার সেরা ও সহজ উপায়—বেঙ্গল কেমিক্যালের অ্যাকোয়া টাইকোটিস আমি সব সময়েই বাড়িতে রাখি। এই ঘনীভূত যোয়ানের আরক নিয়মিত ব্যবহার করলে হজমশক্তি বাড়ে।

সম্পূর্ণ খাঁটি প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী অ্যাকোয়া টাইকোটিস শরীরের কোন ক্ষতি করে না। সকলের পক্ষেই নিরাপদ— শিশুই হোক বা বৃদ্ধই হ'ন।

হাতের কাছেই রাখুন বেঙ্গল কেমিক্যালের

অ্যাকোয়া টাইকোটিস

(যোয়ানের আরক)

পঞ্চাশ বছরের বিশ্বস্ত বন্ধু

বেঙ্গল কেমিক্যালস এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

naa 8923

২১ চৈত্র ১৩৯৬ □ ৪ এপ্রিল ১৯৯০ □ ১৫ বর্ষ ২৫ সংখ্যা

আনন্দমেলা

■ সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ) ■

লাফাং চু দ্রিদিম্বা রহস্য সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৫৪

■ গল্প ■

কাকাবাবুর ভয় এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ২৬

মাছ, পাখি আর রোদ্দুর অধীর বিশ্বাস ৬৭

■ প্রচ্ছদকাহিনী ■

মহাসমুদ্রের আতঙ্ক স্বপনকুমার দাস ১২

সমুদ্রের বিভীষিকা চঞ্চল পাল ১৬

■ ধারাবাহিক উপন্যাস ■

উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৩

সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭৫

■ বিশ্ববিচিত্রা ■

ইয়াকের পিঠে যাযাবরদের দেশে কমল মুখোপাধ্যায় ৫

■ কমিক্স ■

টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৫১, গাবলু ৫৩, টিনটিন ৭১, ব্যাটম্যান ৭৩

■ টাকাকড়ি ■

ভারতে টাকার আবির্ভাব : প্রস্তুতিপর্ব ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭

■ কবিতা ■

এসো, শুরু করি কবিরুল ইসলাম ৩০

■ প্রযুক্তিবিজ্ঞান ■

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার অসীমরতন ঘোষ ৩২

■ কেরিয়ার গাইড ■

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা অমর দাশ ৩৮

■ খেলাধুলো ■

এশিয়াডের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন কবিতা সুমিত দে ৪০

রঙিন পোস্টার : অ্যালান বর্ডার ৪২

কী করে তৈরি হয় চ্যাম্পিয়ান টেনিস-খেলোয়াড়

কৃশানু ভট্টাচার্য ৪৪ রবার্তো বাগিও সন্দীপ বসু ৪৭

মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪৮ খেলার খবর ৪৯

■ নিয়মিত বিভাগ ■

চিঠিচাপাটি ৪, আকাশ চেনো ৯, বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১০, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৫০, আকাশে ওড়ার কথা ৫৮, শব্দসন্ধান ৬৪, ক্যাম্পাস ৬৫, আঁকিবুকি ৭০, হাসিখুশি ৭০, কুইজ ৭৮, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

■ প্রচ্ছদ ■

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল

শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য

সহযোগী □ অসিত পাল, প্রবীর সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

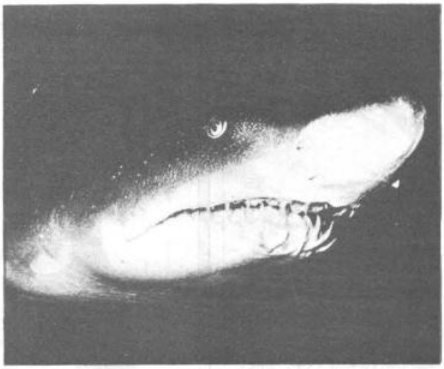

১২

অক্টোপাস কি কামড়ায় ? অক্টোপাসের কি বিষ আছে ? সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হাঙর কোন সমুদ্রে থাকে ? ব্যারাকুডা মাছকে কেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের লোকেরা হাঙরের চেয়েও বেশি ভয় পায় ? এ-ধরনের নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এবারের প্রচ্ছদকাহিনীতে। মহাসমুদ্রের ভয়ঙ্কর প্রাণীদের সম্বন্ধে এই রচনায় আছে অজানা নানা তথ্য। যেমন, মাত্র এক কেজি ওজনের একটি অক্টোপাস আঠারো কেজি ওজনের কোনও বস্তুকে টেনে জলে ডুবিয়ে দিতে পারে।

শঙ্কর মাছের লেজ চাবুকের মতো হলেও তার আসল শক্তি লেজের ডগায় লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত কাঁটা। সাইক্লোন, হারিকেন নিয়েও আছে তথ্য।

৪৪

ভারতের জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ান জিশান আলি কীভাবে নিজেকে আন্তর্জাতিক টেনিসের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছেন সে-সম্পর্কে প্রকাশিত হল একটি নিবন্ধ। এর আগের সংখ্যায় ব্রিটানিয়া-অমৃতরাজ টেনিস স্কুলের খোঁজখবর দেওয়া হয়েছে। আর এবার থাকল ভারত-চ্যাম্পিয়ান টেনিস খেলোয়াড়ের কথা।

৫

তিব্বতের চাং তাং উপত্যকায় বসবাস করে প্রায় পাঁচ লক্ষ যাযাবর। প্রকৃতি এখানে প্রতিকূল। এরই মধ্যে যাযাবররা যেভাবে নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে তা রীতিমত চমকপ্রদ।

■ আগামী সংখ্যায় ■

অভীক মজুমদারের প্রচ্ছদকাহিনী

রহস্যময় অলৌকিক

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের

অলৌকিক গল্প

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সম্পূর্ণ উপন্যাস (শেষাংশ)

লাফাং চু দ্রিদিম্বা রহস্য

অসীমরতন ঘোষের প্রযুক্তিবিজ্ঞান

সফটওয়্যারের মজা

উত্তরকাশী প্রসঙ্গে

১০ জানুয়ারি সংখ্যা 'আনন্দমেলা' পড়ে ভাল লাগল। এই সংখ্যায় 'পাহাড়ে চড়ার মূল কথা সাহস' লেখাটির এক জায়গায় দেখলাম, লেখিকা লিখেছেন—'ট্রেনে উত্তরকাশী (উচ্চতা ১১৬০ মিটার) পৌঁছে, উত্তরকাশী শহর থেকে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের মাথায় 'নিম'-এর বিরাট বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম।' আমার বক্তব্য হল—উত্তরকাশী তো ট্রেনপথে যুক্ত নয়। হৃষীকেশ বা দেরাদুন থেকে বাসপথে যুক্ত।

নবকুমার গরাই
উত্তরপাড়া, হুগলি

কম্পিউটার নিয়ে

৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় 'স্কুলের কম্পিউটার' পড়ে ভাল লাগল। এরকম উৎসাহ জাগানো লেখা খুব কাজে লাগবে পাঠকের।

সোমরাজ দত্ত
কলকাতা-২৬

আমি প্রতিটি সংখ্যাই পড়ি। ৭ মার্চ সংখ্যা থেকে 'কম্পিউটারের ভাষা' নামে একটি লেখা প্রকাশিত হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। আমাদের কাছে এরকম একটি লেখার খুব দরকার ছিল।

গৌতম চ্যাটার্জি
কান্দি, মুর্শিদাবাদ

৭ মার্চ সংখ্যা থেকে 'কম্পিউটারের ভাষা' নামে কম্পিউটার নিয়ে একটি নতুন ধারাবাহিক লেখা প্রকাশিত হচ্ছে। লেখাটি সুন্দর এবং খুবই প্রয়োজনীয়।

সোনিয়া ও রিয়া
রানিগঞ্জ

সামুরাইদের বীরত্বের কাহিনী

আমার প্রিয় পত্রিকা আনন্দমেলা সত্যিই সুন্দর। এর প্রতিটি সংখ্যাই যেন এক-একটি সম্পদ। ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী 'বীর সামুরাই' পড়ে আমার খুব ভাল লাগল। আমার অনুরোধ, এরকম আরও প্রচ্ছদকাহিনী যদি আপনারা প্রকাশ করেন, ভাল হয়। এ ছাড়া ক্ষুদিরাম বসুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে যদি তাঁকে নিয়েও একটি প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশিত হয়, তা হলে আমার ভাল লাগবে।

প্রদীপকুমার পাল
জগদীশপুর হাট, হাওড়া

আমি অনেকদিন ধরে আনন্দমেলা পড়ে আসছি। এই পত্রিকা আমার সবচেয়ে প্রিয় পত্রিকা। ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী বীর সামুরাই পড়ে ভীষণ ভাল লাগল। অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম লেখাটি পড়ে।

অম্লান সরকার
কানাইলাল বিদ্যামন্দির
চন্দননগর

২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা আনন্দমেলা'র প্রচ্ছদকাহিনী বীর সামুরাই পড়ে খুব ভাল লাগল। সামুরাইদের বীরত্ব সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। আমার কাছে এই সংখ্যাটির মূল্য অপরিসীম।

রথীন্দ্রনাথ দে
কোন্নগর, হুগলি

প্রত্যেকটি সংখ্যা আনন্দমেলা খুব মন দিয়ে পড়ি। ২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটি বেশি ভাল লাগল প্রচ্ছদকাহিনীর জন্য। এই সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী বীর সামুরাই পড়ে ভীষণ আনন্দ পেলাম। এই ধরনের আরও প্রচ্ছদকাহিনী প্রকাশিত হলে খুশি হব।

অয়নাভ চক্রবর্তী
শিশুবিহার স্কুল
আগরতলা, ত্রিপুরা

টেবল টপ ক্রিকেট

৭ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় খুব ভাল লেগেছে 'টেবল টপ ক্রিকেট'। এই খেলা খেলেও খুব আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু খেলাটি নিয়ে আমার দুটি প্রশ্ন আছে সিদ্ধার্থ ঘোষের কাছে। (১) বোলারের ওভার শেষ হলে ব্যাটসম্যান কি ব্যাটিং 'স্টার্ট' থেকে পুনরায় শুরু করবেন? (২) অফেনসিভ এবং ডিফেনসিভ ব্যাটিং—কোনও ওভার চলার সময় উইকেট পড়লে কি ব্যাটিং-পদ্ধতির পরিবর্তন করা যাবে?

রাজর্ষি গুপ্ত
বারাসত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়
২৪ পরগনা

লেখকের উত্তর: রাজর্ষি গুপ্তর প্রশ্নের উত্তরে জানাই, বোলারের ওভার শেষ হলে ব্যাটসম্যান 'স্টার্ট' থেকে আবার ব্যাটিং শুরু করতে পারবেন। কোনও ওভার চলার সময় উইকেট পড়লে ব্যাটিং-পদ্ধতির পরিবর্তন করা যাবে। এই দুটি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের জন্য রাজর্ষি গুপ্তকে ধন্যবাদ।

সেরা লাইব্রেরি

২১ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা 'আনন্দমেলা'য় সন্তোষকুমার দে-র 'বিশ্বের সেরা এক লাইব্রেরি' পড়ে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। এই প্রসঙ্গে আমি আরও কয়েকটি তথ্য জানাচ্ছি। এই সেরা লাইব্রেরিটি স্থাপিত হয় ২৪ এপ্রিল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে।
লাইব্রেরিটির ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফল ৬৪·৬ একর বা ২৬·১৪ হেক্টর।

উষা মজুমদার
ত্রিবেণী, হুগলি

ভ্রম সংশোধন: বিজয় অমৃতরাজের কোচ ছিলেন জিশান আলির পিতা আখতার আলি। কিন্তু ২১ মার্চ সংখ্যায় 'কেমন চলছে অমৃতরাজের টেনিস-স্কুল' নিবন্ধে বিজয়ের ছবির ক্যাপশনে ভুল থেকে গেছে। এই ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত।

যাযাবর-রমণী

ইয়াকের পিঠে ডঃ মেলভিন

ইয়াকের পিঠে যাযাবরদের দেশে

চাং তাং উপত্যকার যাযাবরদের বিচিত্র জীবনের কথা লিখেছেন **কমল মুখোপাধ্যায়**

ইয়াকের পিঠে চেপে যাযাবররা পাহাড়ি উপত্যকায় মাইলের পর মাইল ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ায়। মধ্য ও উত্তর তিব্বতে চাং তাং নামের সেই উপত্যকাটি ১৪ হাজার থেকে প্রায় ১৮ হাজার ফুট উঁচু। আড়াইশো বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এখানে বসবাস করে বহু যাযাবরগোষ্ঠী, সংখ্যায় যারা প্রায় পাঁচ লক্ষ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এতটা উঁচুতে এই যাযাবররা ছাড়া আর কোনও মনুষ্যগোষ্ঠী বাস করে না। সারা বিশ্বে যাযাবরদের সংখ্যা এমনিতেই কমে গেছে। চাং তাং-এর যাযাবররা সর্বশেষ যাযাবরগোষ্ঠীগুলির অন্যতম।

হিমালয়ের ওপারে এই উপত্যকায় সব সময় বয়ে যায় ঝোড়ো বাতাস। পাহাড় ছাড়া আর আছে কিছু চারণক্ষেত্র ও হ্রদ। ঘোড়া কিংবা ইয়াকের পিঠে চেপে, কিংবা হাঁটতে হাঁটতে যাযাবররা যখন পাহাড় পেরিয়ে উপত্যকার নানা অংশে ছড়িয়ে পড়ে তখন আর তারা পুরনো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ফিরে আসে না। তাদের মধ্যে আর দেখাসাক্ষাৎও হয় না। শুধু তাই নয়। পাহাড়ের এদিকে-ওদিকে এমন সব যাযাবরগোষ্ঠী আছে যারা কেউ কখনও কারও মুখ দেখেনি। এ এক আশ্চর্য উপত্যকা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এখানে। এমনকী, ৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত দৈনিক তাপমাত্রার তারতম্য হয়। শীতের সময় তাপমাত্রা নেমে দাঁড়ায় মাইনাস ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। হঠাৎ হঠাৎ ঝড় আসে। সেই ঝড় ঘোড়া কিংবা ইয়াকের পিঠ থেকে আরোহীদের উড়িয়ে নিয়ে যায়। তুষারপাত হলে তো কথাই নেই। বরফের নীচে যে কেউ যখন তখন চাপা পড়ে যেতে পারে।

এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় দীর্ঘ ১৬টি মাস কাটিয়ে এসেছেন আমেরিকার দুই নৃবিজ্ঞানী—মেলভিন গোল্ডস্টাইন এবং সিন্থিয়া বিল। ১৯৮৬-র জুনে তাঁরা চাং তাং উপত্যকায় গিয়েছিলেন। পশ্চিমি নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁদেরই প্রথম তিব্বতে গবেষণার অনুমতি দিয়েছিলেন চিনা সরকার। চাং তাং-এর যাযাবরজীবন মুগ্ধ করেছিল তাঁদের। মেলভিন এর আগেও একবার চাং তাং গিয়েছিলেন। সেখানে

ইয়াকদের নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে

যাযাবরদের সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর পর তিনি আমেরিকায় ফিরে যান। এবং ফিরে গিয়ে ঠিক করেন তিনি ও সিন্থিয়া চাং তাং-এর যাযাবরদের নিয়ে গবেষণা করবেন। তাঁরা দুজনেই তখন ওহিয়ো-র ওয়েস্টার্ন রিজার্ভ ইউনিভার্সিটিতে নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক। গবেষণার জন্য তাঁরা বেছে নেন তিব্বতের রাজধানী লাসা থেকে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে ফালা নামক একটি জায়গার যাযাবরদের। ওই গোষ্ঠীতে ছিল ২৬৫ জন যাযাবর। তাদের ছিল ৫৭টি তাঁবু, গৃহস্থালির সামান্য কিছু উপকরণ এবং বেশ কয়েকটি ইয়াক, ভেড়া, ছাগল ও ঘোড়া। তারা ছোট ছোট দলে নিজেদের ভাগ করে নিয়ে বসবাস করে। এক একটি দলের থাকে দুটি থেকে আটটি তাঁবু।

ইয়াকের পিঠে চেপে মেলভিন যাযাবরদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন। মতসোবুন্নি হ্রদের ধারে তিনি দেখেছেন যাযাবরদের ঘরগেরস্থালি। যাযাবরদের মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্ততার সময় গ্রীষ্মকাল। সেই সময়ই ভেড়া ও ছাগলের দুধ বেশি পাওয়া যায়। মেয়েরা সেই দুধ সংগ্রহ করে সারা বছরের জন্য মাখন, পনির ইত্যাদি তৈরি করে রাখে। মেয়েরাই উনুন জ্বালিয়ে রান্না করে, আবার ছেলেমেয়েদেরও সামলায়। পুরুষ ও মেয়েরা নুন-চা খুব বেশি করে খায়। এমনকী, কাউকে কাউকে দিনে ৪০ বারও চা খেতে দেখা যায়। অত্যন্ত রুক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশে এভাবে তারা শরীরটাকে চাঙ্গা রাখে। হ্রদের জল ওরা খায় না। কারণ, ওই জল খুবই নোনা। বরফ গলিয়ে ওরা জল খায়। যাযাবরদের প্রায়ই কোনও না কোনও ঝরনার ধারে তাঁবু ফেলতে দেখা যায়। পাহাড় থেকে নামে ঝরনা। তার জলের গতি তীব্র। তাই বরফ জমতে পারে না। এই জল যাযাবররা খায়। যখন ঝরনার থেকে দূরে অন্য কোথাও ওদের তাঁবু ফেলতে হয় তখন বরফ-গলানো জলই ওদের সম্বল।

বিশ্বের অধিকাংশ যাযাবরই তাদের পালিত পশুদের শীতের সময় উপত্যকায় রেখে দেয়, আর গ্রীষ্মের সময় তাদের পাঠিয়ে দেয় পাহাড়ের কাছাকাছি। কিন্তু চাং তাং উপত্যকায় যাযাবররা ঠিক এর উলটোটা করে থাকে। চাং তাং-এর পাহাড়ে শীতের সময় বিশেষ এক ধরনের উদ্ভিদ জন্মায়। সেটাই হয় ইয়াকদের খাদ্য। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ইয়াকদের চরাতে নিয়ে যায়। তখন বয়স্ক পুরুষ ও নারীরা তাঁবুতে থাকে। এই যাযাবরদের মধ্যে কারও কারও অবস্থা ভাল। তারা তাঁবুতে থাকে না। তারা নিজেরাই পাকা বাড়িঘর তৈরি করে নেয়। যাযাবরদের একটি প্রিয় খাদ্য 'সাম্‌বা'। বার্লি উনুনে সেঁকে নিয়ে জাঁতায় পিষে ময়দার মতো একটি জিনিস তৈরি করা হয়। এটাই সাম্‌বা। এ দিয়েই তারা খাবার তৈরি করে। মেলভিন ও সিন্থিয়া দেখেছেন, চাং তাং উপত্যকায় যাযাবররা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু। কিন্তু তাদের জীবন বেশ আনন্দের। জাগতিক দুঃখকষ্টকে তারা কখনওই বড় করে দেখে না। তবে মেলভিন ও সিন্থিয়া যখন প্রথম ওই উপত্যকায় গিয়ে প্রবীণ যাযাবর ত্রিনলিকে নিজেদের পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন, তখন ত্রিনলি জানান, "এখানে আপনাদের পক্ষে বসবাস করা সম্ভব নয়। শীতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আর ঝোড়ো বাতাস। আমরা, ড্রক্‌বারাই শুধু এখানে টিকে থাকতে পারি।" ড্রক্‌বা মানে যাযাবর।

তবু দীর্ঘ ১৬টি মাস সেখানে ছিলেন মেলভিন ও সিন্থিয়া। তাঁরা দুজনেই যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে নিজেদের গবেষণার কাজ চালিয়েছিলেন। বিদেশিনী সিন্থিয়ার কৃতিত্ব বোধ হয় বেশি। মেয়ে হয়ে তিনি যেভাবে সাহসের সঙ্গে উপত্যকার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াতেন তাতে তাঁর প্রশংসা করতেই হয়। উঁচু পাহাড়ি এলাকায় থাকার জন্য যাযাবরদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন দিক নিয়েও তাঁরা গবেষণা করেন। রক্তের চাপ মাপার যন্ত্র নিয়ে সিন্থিয়া যাযাবরদের শিবিরে শিবিরে ঘুরে তাদের রক্তের চাপ পরীক্ষা করতেন। যাযাবররা তাঁকে আপন করে নিয়েছিল।

যাযাবররা ছাগল ও ভেড়া পুষলেও ইয়াকই তাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। ইয়াকের পিঠে চেপে তারা দূরদূরান্তে পাড়ি দেয়। আবার ইয়াকের চামড়া দিয়েও তারা তৈরি করে তাঁবু। ইয়াক প্রচুর দুধও দেয়। অত্যন্ত ভারবহনক্ষম এই প্রাণীটির মাংস, চামড়া ও লোম—সবই যাযাবরদের কাজে লাগে। ইয়াকের চামড়া দিয়ে যাযাবররা জুতোও তৈরি করে। তৈরি করে পোশাক, দড়ি-দড়া। চাং তাং-এর যাযাবররা সাধারণভাবে ইয়াককে বলে 'নর'। তাদের ভাষায় নর শব্দের অর্থ—সম্পদ।

সারা পৃথিবী জুড়ে যখন আধুনিকতার জোয়ার বইছে, তখন চাং তাং-এর যাযাবররা তাদের ঐতিহ্যসম্মত জীবনযাত্রা পুরোদস্তুর বহাল রেখেছে। সভ্যতার ইতিহাসে এ এক বড় ঘটনা।

ফোটো : ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর সৌজন্যে

যাযাবররা সারাদিনই ব্যস্ত থাকে কাজে

এ এক আশ্চর্য উপত্যকা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সেখানে। এমনকী, ৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত দৈনিক তাপমাত্রার তারতম্য হয়। শীতের সময় তাপমাত্রা নেমে দাঁড়ায় মাইনাস ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। হঠাৎ হঠাৎ ঝড় আসে। ইয়াকের পিঠ থেকে আরোহীদের উড়িয়ে নিয়ে যায়।

তাঁবুর জীবনে নেই আধুনিক পৃথিবীর হাতছানি

টাকাকড়ি

ভারতে টাকার আবির্ভাব : প্রস্তুতিপর্ব

ভারতে টাকা প্রচলনের আগের পরিবেশ কেমন ছিল, সে-সম্পর্কে জানিয়েছেন **ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**

ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে মেহেরগড়ে (বর্তমান পাকিস্তানের সীমানাভুক্ত বালুচিস্তানের কাচ্চি অঞ্চল) প্রাচীন এক সভ্যতার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেগুলি দেখে মনে হয়, স্থানীয় লোকেরা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম সহস্রাব্দেই কৃষি ও বাণিজ্যের সঙ্গে সুপরিচিত ছিল। ভারতের অন্য কিছু অঞ্চলের সঙ্গে, এমনকী বহির্ভারতীয় কোনও-কোনও ভূখণ্ডের সঙ্গেও এদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মেহেরগড় সভ্যতার আরও উল্লেখযোগ্য বিবর্তন ঘটেছিল ৩৫০০ থেকে ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। অর্থাৎ, সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার (আনুমানিক ২৩০০ থেকে ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) আগে। প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার বসতিগুলিতেও বাণিজ্যিক পণ্যের এবং কয়েকটি শহরে দূর দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই দুই সভ্যতার মানুষেরা নিশ্চয় দ্রব্যবিনিময় প্রথা (bartar system) এবং দ্রব্য-অর্থ (commodity money) ব্যবহারের কথা জানতেন। দ্বিতীয়টি ব্যবহার না করলে নিয়মিত বাণিজ্য করা মুশকিল। মেহেরগড়ে না হলেও সিন্ধু সভ্যতার অন্তত কয়েকটি শহরে দ্রব্য-অর্থ হিসাবে ধাতুর ব্যবহার সম্ভবপর ছিল। কেননা, ওই সভ্যতার

মহেঞ্জো-দরোর আবিষ্কৃত রুপোর পাত্র

মহেঞ্জো-দরোর বিখ্যাত স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ

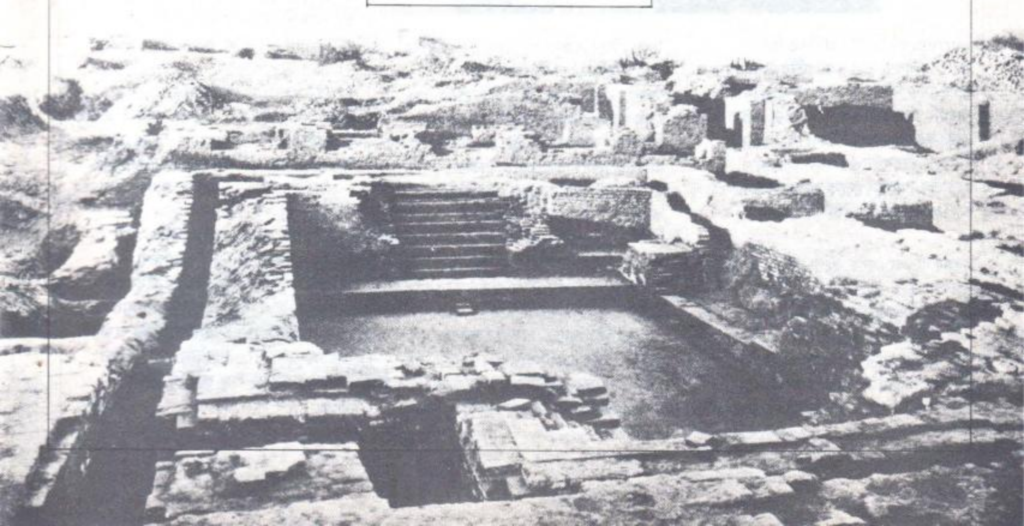

মানুষেরা তামা, রুপো, সোনা প্রভৃতির ব্যবহার জানতেন।

এই প্রসঙ্গে মহেঞ্জো-দরোতে আবিষ্কৃত এগারোটি রৌপ্যখণ্ডের উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি রৌপ্য-আধারের মধ্যে কয়েকটি গয়নার সঙ্গে এগুলি পাওয়া গিয়েছিল। ধাতুখণ্ডগুলির আকার গোল, চৌকো এবং আয়তক্ষেত্রের মতো। দুটি আবার অনিয়মিত আকারের। এগুলির মধ্যে ন'টির ওজন সিন্ধু সভ্যতার প্রচলিত তৌল বা ওজনরীতির বিভিন্ন ওজনের সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায়। অন্য কোনও দ্রব্য ওজনের জন্য বাটখারা হিসাবে ওই ছোট ছোট খণ্ডগুলি ব্যবহারের অনুপযুক্ত। সুতরাং এটা মনে করা যুক্তিযুক্ত যে, নির্দিষ্ট ওজনে তৈরি ধাতবখণ্ডগুলি ধাতব বিনিময়-মাধ্যম (metallic medium currency) হিসাবে প্রচলিত ছিল।

রুপো মূল্যবান ধাতু। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাক-সিন্ধু সভ্যতার যুগে এই ধাতু নিয়মিত ব্যবহার করা হয়েছিল বলে জানা নেই। তবে, সিন্ধু সভ্যতার কয়েকটি শহরে, বিশেষত, মহেঞ্জো-দরোতে, এর বহুল প্রচলন হয়েছিল। এখান থেকে রুপোর বিভিন্ন আধার ও গয়না পাওয়া গেছে।

যেসব অঞ্চল থেকে রুপো আমদানি করা সম্ভবপর ছিল সেগুলির মধ্যে একটি বোধ হয় সুমের (যা আজ ইরাকের সীমানাভুক্ত)। এর সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের কথা আমরা জানি। এই অঞ্চল থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম পাদে বিদেশে রুপো রফতানি করার প্রমাণ আছে।

মহেঞ্জো-দরোতে উৎখননের সময় যে স্তর থেকে ইতিপূর্বে উল্লিখিত ধাতুখণ্ডগুলি সমেত রৌপ্য-আধারটি পাওয়া গেছে, তার তারিখ ওই শহরের শেষ যুগের, অর্থাৎ, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের প্রথম পাদের শেষের ভাগে। এই সময় সুমের থেকে রুপো রফতানি করা হত। তার ওপরে আবার মহেঞ্জো-দরোতে প্রাপ্ত ধাতুখণ্ডগুলির যে দুটি সিন্ধু সভ্যতার ওজনরীতি অনুযায়ী তৈরি নয়, তাদের একটিতে সুমেরে প্রচলিত কীলক আকার বিশিষ্ট (cuneiform) লিপিতে উৎকীর্ণ এক লেখ আছে। এটি নিশ্চয় সুমের অঞ্চল থেকে আনা হয়েছিল। তাই মনে হয়, সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট ওজনের ধাতবখণ্ডকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণের মূলে বোধ হয় পশ্চিম এশিয়ার প্রভাব ছিল। তবে এজন্য যে ওজনরীতি ব্যবহার করা হয়েছিল, তা ছিল ভারতীয়।

বাণিজ্যের বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত ধাতুগুলির মান ও ওজন সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের নিশ্চিন্ত করবার জন্য কোনও বিশ্বাসযোগ্য কর্তৃপক্ষের নাম বা প্রতীক উৎকীর্ণ করলেই এগুলি টাকায় পরিণত হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সিন্ধু সভ্যতার যুগের শেষ ভাগে, অর্থাৎ, আনুমানিক ১৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগেই এই উপমহাদেশের এক অংশের অর্থনৈতিক অবস্থা টাকার আবির্ভাবের এক অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল। বাণিজ্যের বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত ধাতুগুলির মান ও ওজন সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের নিশ্চিন্ত করবার জন্য কোনও বিশ্বাসযোগ্য কর্তৃপক্ষের নাম বা প্রতীক উৎকীর্ণ করলেই এগুলি টাকায় পরিণত হতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। তার একটা কারণ, এই সময় সিন্ধু সভ্যতা ও তার অর্থনীতির অবক্ষয় ঘটেছিল। তথাকথিত আর্যরা সিন্ধু সভ্যতার পতনের একটি, অথবা প্রধান কারণ ছিলেন কি না সে-সম্পর্কে তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ঋগ্বেদে যে সমাজচিত্র আমরা পাই তা ছিল প্রধানত গ্রামীণ। এই অবস্থায় দ্রব্য-বিনিময় বা দ্রব্য-অর্থ-বিনিময় ব্যবস্থাই যথেষ্ট। কিন্তু এই সূত্রে ঋগ্বেদে 'নিষ্ক' কথাটির ব্যবহারের উল্লেখ ও তার আলোচনার প্রয়োজন আছে। সাধারণত এই শব্দটি সোনার গয়না বোঝাতে ব্যবহৃত হত। কিন্তু যেখানে নিষ্ক কথাটির আগে 'শত' শব্দটি বিশেষণ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে (১, ১২৬, ২) সেখানে কোনও নির্দিষ্ট ওজনের একশোটি সোনার খণ্ডের ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে ঋগ্বেদের সমাজে নির্দিষ্ট ওজনের ধাতবখণ্ড বিনিময় মাধ্যমের অস্তিত্বের সম্ভাবনা অস্বীকার করার উপায় নেই।

উত্তর-বৈদিক যুগের (Later Vedic Period) কিছু তথ্য এই সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে। শতপথ ব্রাহ্মণে 'শতমান হিরণ্য' (৫, ৫, ৫, ১৬) এবং কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে শতমান হিরণ্য ও রৌপ্যের উল্লেখ আছে (১৬, ৩০ ও ৪৫)। এগুলি কোনও নির্দিষ্ট মানের (Standard-এর) এককের (unit-এর) একশো গুণ ওজনের সোনা বা রুপোর খণ্ড। শেষোক্ত বইটি সম্পর্কে এক ভাষ্যে এই এককের ওজন বলা হয়েছে এক কৃষ্ণল বা রতি। এক রতির ওজন প্রায় ১·৮ গ্রেন। সুতরাং এই খণ্ডগুলি ছিল ১৮০ গ্রেনের। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিদেহর রাজা জনক কর্তৃক এক যজ্ঞানুষ্ঠানে যে 'পাদ' (বা এক-চতুর্থাংশ) খণ্ডগুলির দক্ষিণা (বা উপহার) দেওয়ার কথা লেখা হয়েছে (৩, ১, ১), সেগুলি বোধ হয় শতমান বা ১৮০ গ্রেনের এক-চতুর্থাংশ, অর্থাৎ ৪৫ গ্রেনের সোনা বা রুপোর খণ্ড।

ওপরের তথ্যগুলি থেকে মনে হয় যে, উত্তর-বৈদিক যুগ শেষ হওয়ার আগেই অর্থাৎ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষের আগেই ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি আশ্রিত সমাজে নির্দিষ্ট ওজনের ধাতবখণ্ড বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে এই কৃষ্টির প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে বড়-বড় রাজ্য গড়ে উঠছিল, ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি অনুরাগী শক্তি অধিকৃত ভূখণ্ডে কৃষিকর্মের প্রসার হচ্ছিল, কৃষিজ ও অন্যান্য পণ্যের সরবরাহ বাড়ছিল। সেইসঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে নগরায়ণের (urbanisation) বা শহরের পত্তন করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল।

(ক্রমশ)

চৈত্র মাসের আকাশ

বিকেলে কালবৈশাখীর কালো মেঘের আকাশ সন্ধ্যায় নির্মেঘ। এই নির্মল তারকাখচিত আকাশের কথা লিখেছেন **অরূপরতন ভট্টাচার্য**

বছর শেষ হতে চলল। কালবৈশাখীর কালো মেঘে ঢাকা পড়ন্ত বেলা ছাড়া এখনকার আকাশ নির্মেঘ, নির্মল।

যোদ্ধার বেশে কালপুরুষ পশ্চিম আকাশে প্রায় অস্তগামী। তার ঈষৎ উত্তর-পূর্বে পুনর্বসুদ্বয়কে নিয়ে মিথুন রাশি। মিথুনের দক্ষিণে সামান্য পূর্বদিক ঘেঁষে রাশিচক্রের চতুর্থ রাশি অনুজ্জ্বল কর্কটও তাকে অনুসরণ করছে। অনুজ্জ্বল কর্কটের পূর্বে সন্ধের অন্ধকারে অনেক উজ্জ্বল তারা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে। এই তারাগুলিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে রাশিচক্রে কর্কটের ঠিক পরের রাশিটি। এটি পঞ্চম রাশি সিংহ, বিদেশী নাম লিও।

সিংহ রাশিতে সিংহের আকৃতিটা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না। সিংহের মুখ কর্কটের দিকে, লেজ পূর্বে, সেইসঙ্গে পা দুটিও পরিষ্কার বোঝা যায়। সামনের পায়ের উপরে একটি উজ্জ্বল তারা আছে, নাম মঘা। এই তারাটি মণ্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা। খালি চোখে দেখা উজ্জ্বল তারকাদের ক্রমে এটি বিংশতি তারকা। এটিকে নিয়ে চাঁদের সাতাশ স্ত্রীর দশম স্ত্রীর কল্পনা করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে দশম চান্দ্র-তিথি।

সিংহ রাশির তারায়-তারায় আরও দুটি চান্দ্র-তিথি এবং চাঁদের স্ত্রীকে নির্দিষ্ট করেছেন প্রাচীনকালে আমাদের দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এ দুটি হল পূর্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনী। মঘা ছিল দশম, পূর্বফল্গুনী একাদশ, উত্তরফল্গুনী দ্বাদশ। পূর্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনী গড়ে উঠেছে সিংহ রাশির পুচ্ছের তারায় তারায়। পূর্বফাল্গুনী আছে সিংহের শরীর যেখানে শেষ হয়ে লেজ শুরু হল সেখানে আর উত্তরফল্গুনী পুচ্ছের একেবারে প্রান্তভাগে।

এ-মাসে সন্ধের অন্ধকারে আকাশে একটি বিশিষ্ট তারকামণ্ডল নজরে আসবে। উত্তর আকাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এটির অবস্থান, নাম সপ্তর্ষি, বিদেশী নাম উর্ষা মেজর।

চেহারার দিক থেকে সপ্তর্ষি অনেকটা জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মতো দেখতে। উজ্জ্বল সাতটি তারার এক জিজ্ঞাসা-চিহ্ন, জিজ্ঞাসার মুখটি আছে উত্তর দিকে আর তার পুচ্ছভাগ শেষ হয়েছে পূর্বের আকাশে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলে যে সাতটি তারা আছে তার কোনটির কী নাম? মণ্ডলটির পূর্বপ্রান্তে আছে যে তারাটি, তার নাম মরীচি, তারপর বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, অত্রি। অত্রির দক্ষিণে পুলস্ত্য, পুলস্ত্যের পশ্চিমে পুলহ ও পুলহের উত্তরে ক্রতু।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক থেকে বশিষ্ঠ তারাটির বিদেশী নাম মিজার। এটি একটি সাদা তারকা, সপ্তর্ষির উজ্জ্বলতম তারকাদের একটি। বর্ণালী বিশ্লেষণে যেসব তারকা যুগ্ম তারকা হিসেবে জানা

সিংহ

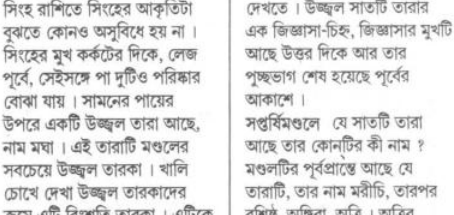

কর্কট

গেছে, সেই ধরনের সমস্ত তারাদের মধ্যে এটি ধরা পড়ে সকলের আগে, আজ থেকে ১০০ বছর আগে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। যুগ্মতারারা একে আর-একটিকে ঘিরে আবর্তন করে। দেখা গেছে এক্ষেত্রে আবর্তনকাল ২০ দিনের মতো। যুগ্মতারার দ্বিতীয় তারাটিও নিজে যুগ্মতারা। তবে তাও বোঝা যায় বর্ণালী বিশ্লেষণে। এর আবর্তনকাল অবশ্য অনেক বেশি, ৩৬১ দিন। তা ছাড়া অরুন্ধতী তো বশিষ্ঠের সঙ্গেই আছেন।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের যে তারাটি বশিষ্ঠ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলে সে তারাটিকে একটু ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যাবে বশিষ্ঠের খুব কাছে বলে এটির নাম অরুন্ধতী। অরুন্ধতী হলেন বশিষ্ঠের স্ত্রী।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারার মধ্যে পুলহ আর ক্রতুকে যোগ করে উত্তর দিকে বাড়িয়ে দিলে একটি বিশেষ তারায় গিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায়। তারাটি হল ধ্রুবতারা। ধ্রুবতারা উজ্জ্বল নয়। কিন্তু সপ্তর্ষিমণ্ডলকে ধরে ধ্রুবতারাকে চেনা যায় সহজে। এককালে নাবিকদের কাছে এই ধ্রুবতারা ছিল পথ-নির্দেশক তারকা। অন্ধকার রাতের পথিকদের কাছেও ছিল তাই। অন্ধকার বা দিশেহারা পথে বুঝব কী করে কোনটা কোন্ দিক? ধ্রুবতারাকে চিনলে উত্তর দিকের হিসেব পাওয়া যায়। সঙ্গে-সঙ্গে চেনা যায় অন্যান্য দিকও।

উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখার পরে একটু মাঝ আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলে একটি ছোট মণ্ডল নজরে আসবে উত্তর আকাশেই। সিংহ রাশির সামান্য উত্তরে আছে মণ্ডলটি। নাম লঘু সিংহ। বিদেশী নাম লিও মাইনর।

সিংহ রাশি তেজোদীপ্ত, তারায়-তারায় সিংহের যে পরিচয় ফুটে ওঠে তা দেখার মতো। কিন্তু যে সিংহ লঘু, তার ওরকম তেজ থাকার কথা নয়, আকারেও সে ছোটখাটো। সত্যি কথা বলতে কি, লঘু সিংহের কোনও তারাই তেমনভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তবু ছোট মণ্ডলটি উত্তর আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল আর আকাশের মাঝ বরাবর সিংহ রাশির মধ্যে ঠিক চেনা যায়।

আকাশে এক-এক মাসে রাতের বিভিন্ন প্রহরে এক-একটা তারকামণ্ডল উঠে আসে মাথার উপরের আকাশে। তারপর ঋতু বদলের মতো তারাও জায়গা বদলায়। কিন্তু একবার এদের সঙ্গে পরিচয় হলে আর কখনও চিনে নিতে অসুবিধে হয় না।

ইলেকট্রনিক
রোদ-চশমা

টিভি পরদার উজ্জ্বলতা আমরা খুশিমতো কম-বেশি করতে পারি ছোট্ট একটা নব ঘুরিয়ে। কিন্তু রোদ-চশমা বা সানগ্লাসের কাচের রং কতটা গাঢ় হবে, তা কি ব্যবহারকারী নিজের খুশিমতো ঠিক করতে পারে? এই আপাত-অবিশ্বাস্য ব্যাপারটিকে সম্ভব করে তুলেছে নিউ ইয়র্কের উডবেরির রিসার্চ ফ্রন্টিয়ার্স ইনকর্পোরেটেড। তাদের তৈরি ইলেকট্রনিক রোদ-চশমার কাচের রং ব্যবহারকারী ইচ্ছেমতো পালটাতে পারে। যেমন, গাড়ি চালানোর সময়ে কাচের রং হবে হালকা, আর সমুদ্র-সৈকতে শুয়ে রোদ-পোহানোর সময়ে কাচের রং গাঢ় হওয়া প্রয়োজন।
কম্পানির বক্তব্য অনুযায়ী তাদের রোদ-চশমার বিশেষ ধরনের কাচ সূর্যের আলোর শতকরা ৪৪ ভাগ থেকে ৮৮ ভাগ ছেঁকে বাদ দিতে পারে চোখের নিমেষে।
রোদ-চশমার ফ্রেমে লুকনো অতি খুদে কয়েকটি ব্যাটারি চশমার কাচে বিদ্যুৎশক্তি জোগায়। চশমার এক-একটা কাচ দুটি কাচ বা প্লাস্টিকের 'দেওয়াল' দিয়ে তৈরি। দুটি দেওয়ালের মাঝে ফাঁক রয়েছে এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম। দেওয়ালের ভেতরের দিকে বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থের আস্তরণ রয়েছে। আর বাকি জায়গা জুড়ে রয়েছে একটি জৈব তরল। আর এই তরলে নিলম্বিত অবস্থায় ভাসছে ছুঁচের মতো চেহারার লক্ষ লক্ষ খুদে কেলাস। কম্পানির সভাপতি রবার্ট স্যাক্স জানিয়েছেন, যখন ভোল্টেজ অফ থাকে তখন সূর্যের আলো পুরোপুরি রোধ করে দেয় একটি গাঢ় নীল আলোক-ভালভ। আর ভোল্টেজ অন করলেই একটি বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র তৈরি হয়, যার ফলে কেলাসগুলো অনুভূমিকভাবে সাজানো হয়ে যায়। তখন আলোক-ভালভ স্বচ্ছ হয়ে যায়। এই স্বচ্ছতার মান নির্ভর করে প্রযুক্ত ভোল্টেজের মানের ওপরে। এরকম বিচিত্র একটি রোদ-চশমার আনুমানিক দাম পড়বে প্রায় ২০০ ডলার। এটি বাজারে ছাড়তে এখনও প্রায় দু' বছর সময় লাগবে বলে স্যাক্স জানিয়েছেন।

শিশুর প্রাণ বাঁচাতে
অভিনব নল

ম্যাক গোর এবং বারবারা গোর-এর তিন বছরের শিশুটি মেজাজে আঙুর খাচ্ছিল। হঠাৎই বিপদ। একটা আঙুর গেল তার গলায় আটকে। দম বন্ধ হয়ে প্রাণ যাওয়ার জোগাড়। কিছুতেই কিছু হয় না। তখন ম্যাক বাচ্চার মুখে মুখ লাগিয়ে স্রেফ চুষে বের করে ফেলল বিপজ্জনক আঙুরটি। এরপরই ম্যাক ও বারবারার মাথায় একটা নতুন মতলব এল। এই ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটা নল তৈরি করলে কেমন হয়! সেই নলটা বাচ্চার গলায় ঢুকিয়ে জোরে চুষলেও বেরিয়ে আসবে গলায় আটকানো বস্তু। সুতরাং এইভাবেই জন্ম নিল ট্রাকিয়াল সাকশন টিউব। ক্ষতিকারক-নয়-এমন নরম পি ভি সি-র তৈরি। দাম দশ ডলারেরও কম।

ছবি : দেবাশিস দেব

কীটনাশকের
বদলে পাখি

চিড়িয়াখানার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে যাঁরা আছেন, ব্যাপারটা

তাঁরা বহু আগে থেকেই জানতেন। কিন্তু ঘরোয়া বাগানের তদারকি যাঁরা করেন তাঁরা এটা লক্ষ করেছেন সম্প্রতি। ব্যাপারটা হল: ক্ষতিকারক বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার না করে পাখিদের কাজে

ক্র্যাফট-পরিকল্পিত ক্যাপসুলটিকে নামিয়ে দেওয়া হ

সঙ্কল্পে অটল মরিস ক্র্যাফট

ফরাসি ভূতাত্ত্বিক মরিস ক্র্যাফটকে উন্মাদ বললেও বোধ হয় কম বলা হবে। ফ্রান্সের 'সার্নে'র আগ্নেয়গিরি গবেষণা-কেন্দ্রের এই ফরাসি ভূতাত্ত্বিক সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় দেড়শোটি অগ্ন্যুৎপাত দেখে বেড়িয়েছেন। শুধু ১৯৮৮ সালেই ক্র্যাফট ও তাঁর স্ত্রী হাওয়াই থেকে শুরু করে তানজানিয়া, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, কোস্টা রিকা এবং পূর্ব মাদাগাস্কার পর্যন্ত ছুটে গেছেন অগ্ন্যুৎপাত দেখার জন্য। এখন তাঁর ইচ্ছে জেমিনি স্পেস ক্যাপসুলের আকারে তৈরি দু'টি আসনবিশিষ্ট যানে চেপে লাভার স্রোত পাড়ি দেবেন। ক্র্যাফটের সতীর্থরা ইতিমধ্যেই তাঁর নাম দিয়েছেন 'ডঃ ভলক্যানো' এবং তাঁর পরিকল্পনাকে তুলনা করেছেন জুলে ভার্নের উপন্যাস 'জার্নি টু দ্য সেন্টার অব দ্য আর্থ'-এর সঙ্গে। কিন্তু কোনও কথায় কান দেওয়ার সময় নেই ক্র্যাফটের। তিনি এখন গভীরভাবে ভাবছেন, অগ্ন্যুৎপাত চলার সময় কোনও আগ্নেয়গিরির মধ্যে কীভাবে ঢোকা যায়। উদ্দেশ্য, সঠিকভাবে ভূ-কম্পনের সময় নির্ধারণ করা। এর ফলে বড় কোনও দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। এতদিন এই হিসেব চলত দূরে বসে যন্ত্রের সাহায্যে। ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তাই সামান্য হলেও থেকে যেত। কিন্তু এবার সেই সামান্য ভুলটুকুও যাতে না হয়, সেজন্য ক্র্যাফট ঠিক করেছেন পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করবেন। চোখের সামনে দেখবেন টগবগ করে ফুটতে থাকা ম্যাগমার ওঠা-পড়া, স্রোতের গতি-প্রকৃতি, ভূ-স্তরের কোন অংশ দিয়ে ঠেলে বেরোতে চাইছে ওপরে, কত সময় লাগবে তা বেরিয়ে যেতে এবং ভূ-স্তরের সেই অংশ অগ্ন্যুৎপাত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট দুর্বল কি না।
ক্র্যাফট-পরিকল্পিত ক্যাপসুলটিকে নামিয়ে দেওয়া হবে জ্বালামুখের ভেতর হেলিকপ্টার থেকে। এবং পরিক্রমার শেষে লাভাস্তরের ওপরে যখন আবার উঠে আসছে সেই ক্যাপসুল তখন আকাশ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে হুক লাগানো লোহার দড়ি। তারপর ধীরে-ধীরে নিয়ে আসা হবে বাইরে। কোনও অবস্থায় যদি হুকটি ক্যাপসুল পর্যন্ত না এসে পৌঁছয়, সেজন্য থাকবে বিশেষভাবে তৈরি একটি 'সেফটি

লাগানো যেতে পারে। যেমন, যেসব পাখি পোকামাকড় খায়, তাদের যদি গ্রিনহাউসে রেখে দেওয়া যায় তা হলে তারা দিব্যি পোকামাকড় ধ্বংস করে মনের সুখে বেঁচে থাকতে পারে। সবচেয়ে বেশিরকমের পোকামাকড় যে-পাখির খাদ্যতালিকায় রয়েছে তার নাম ফিঞ্চ, অর্থাৎ মুনিয়া জাতের পাখি। এদের মধ্যে আবার সবচেয়ে উপযুক্ত জেব্রা ফিঞ্চ। এই পাখি দোকানে অহরহ পাওয়া যায়, আর এদের যত্নআত্তির বিশেষ কোনও ঝামেলা নেই। শুধু নিয়মিত পোকামাকড়ের জোগান পেলেই হল। সুতরাং এখন থেকে ঘরোয়া বাগানের নির্বিষ জীবন্ত 'কীটনাশক' হতে চলেছে ফিঞ্চ পাখি।

খুদে রোবটের ধাঁধা

প্রায় পাঁচ বছর ধরে 'রোবট-ইঁদুর' তৈরি করছেন এম·আই·টি-র গবেষক বিজ্ঞানী ডেভ ওটেন। পরিভাষায় এই খুদে রোবটগুলোকে বলা হয় 'মাউস'। প্রায় ১০০ বর্গফুট জায়গা জুড়ে তৈরি করা হয়েছে একটি গোলকধাঁধা। দু' ইঞ্চি উঁচু পাঁচিলের জ্যামিতিক নকশা তৈরি করেছে সাত ইঞ্চি চওড়া পথের জটিল মানচিত্র। এই পথে কিছুক্ষণ পর-পরই একটি করে ইলেকট্রনিক মাউস বসিয়ে দেন ওটেন। এদের নিয়ে ওটেনের এই গবেষণা আগামী দিনের স্বয়ংক্রিয় স্থলযানের কারিগরি নকশার ভিত তৈরি করে

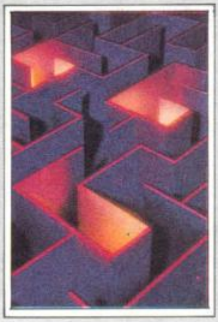

দেবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যেসব গবেষণা আজ পৃথিবী জুড়ে হচ্ছে, তার অন্যতম উপকরণ মাউস নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ ছাড়া প্রতি বছর পৃথিবীর নানা শহরে মাউস নিয়ে প্রতিযোগিতাও হয়। এর মধ্যে লন্ডন, সিঙ্গাপুর, জাপান এগিয়ে। ওটেনের ইচ্ছে মাউস প্রতিযোগিতায় তাঁর মাউস সবচেয়ে কম সময়ে গোলকধাঁধার বাইরে বেরিয়ে এসে প্রথম পুরস্কার জিতে নিক।

গবেষণার পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলে মন্দ কী! গত বছরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ২০০টি মাউস প্রতিযোগীর মধ্যে ১৯০টিই ছিল জাপানে তৈরি। কিন্তু মাউসের কারিগরি দক্ষতায় ওটেন ইতিমধ্যেই জাপানিদেরও ছাড়িয়ে গেছেন।

জ্বালামুখের ভেতর হেলিকপ্টার থেকে...

হ্যাচ', যা খুলে ক্র্যাফট এবং তাঁর সহকর্মী বেরিয়ে এসে হুকটিকে ঠিক জায়গায় লাগিয়ে দিতে পারেন।

এই লাভা-যানটি হবে শঙ্কু আকৃতির। তার ওপর আগাগোড়া থাকবে টাইটানিয়াম অক্সাইডের প্রলেপ। এর কারণ টাইটানিয়াম অক্সাইড ২২০০ ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। অতএব, আগ্নেয়গিরির ভেতর প্রবেশ করলে ক্যাপসুলের কোনও ক্ষতি হবে না। বাইরের তাপ যাতে কখনওই না ক্যাপসুলের ভেতরে গিয়ে পৌঁছয় সেজন্য ভেতরে সম্পূর্ণ মোড়া থাকবে বিশেষভাবে তৈরি ধাতুর টালি দিয়ে, ঠিক যেমন থাকে কোনও কৃত্রিম উপগ্রহের বাইরে।

স্বপ্নের এই যানটি তৈরি হওয়ার পরেও কিন্তু ক্র্যাফটের অনেক অসুবিধে থেকে যাবে। সবচেয়ে বড় অসুবিধে হল, ক্র্যাফট তাঁর অভিযানে সম্ভবত কোনও সঙ্গী পাবেন না। এখন থেকেই অনেকে এ-ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। হাওয়াইয়ান ভলক্যানো অবজারভেটরির প্রধান বিজ্ঞানী টম রাইট এ-ব্যাপারে সবচেয়ে সরব। তাঁর মতে ক্র্যাফট তাঁর চেয়েও অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে পারেন। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মনে করছেন, তাঁরা যখন পৃথিবীর ওপর পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্রে বসেই কম্পিউটার প্রোগ্রাম, টোমোগ্রাফি, ইনফ্রা রেড ফোটোগ্রাফি, রিমোট সেন্সিং এবং অন্যান্য আধুনিক পদ্ধতিতে অনেক সহজে আগ্নেয়গিরি ও অগ্ন্যুৎপাতের নানা খবর পাচ্ছেন তখন এরকম বিপদের পথে পা বাড়ানো অর্থহীন।

ভূ-কম্পন বিশেষজ্ঞ কার্ল জনসন এবং কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ টম ইংলিশ মনে করেন ক্র্যাফট আদৌ জ্বালামুখের ভেতরে ঢুকতে পারবেন না। তার অনেক আগেই তাঁর কর্নিয়া নষ্ট হয়ে যাবে প্রচণ্ড তাপে। কোনও প্রাণীর পক্ষে কোনও অবস্থাতেই ওই পরিবেশে টিকে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ক্র্যাফট তাঁর সঙ্কল্পে অটল।

প্রচ্ছদকাহিনী

মহাসমুদ্রের আতঙ্ক

মহাসমুদ্রের জীবন্ত বিভীষিকা হল হাঙর, তিমি, অক্টোপাস। তা ছাড়াও আছে আরও অনেক প্রাণী, যারা রীতিমত আতঙ্ক। মহাসমুদ্রের এই প্রাণীদের আক্রমণে মাঝেমধ্যেই বিপন্ন হয়েছে মানুষ। ভয়ঙ্কর এই প্রাণীদের কথা লিখেছেন স্বপনকুমার দাস

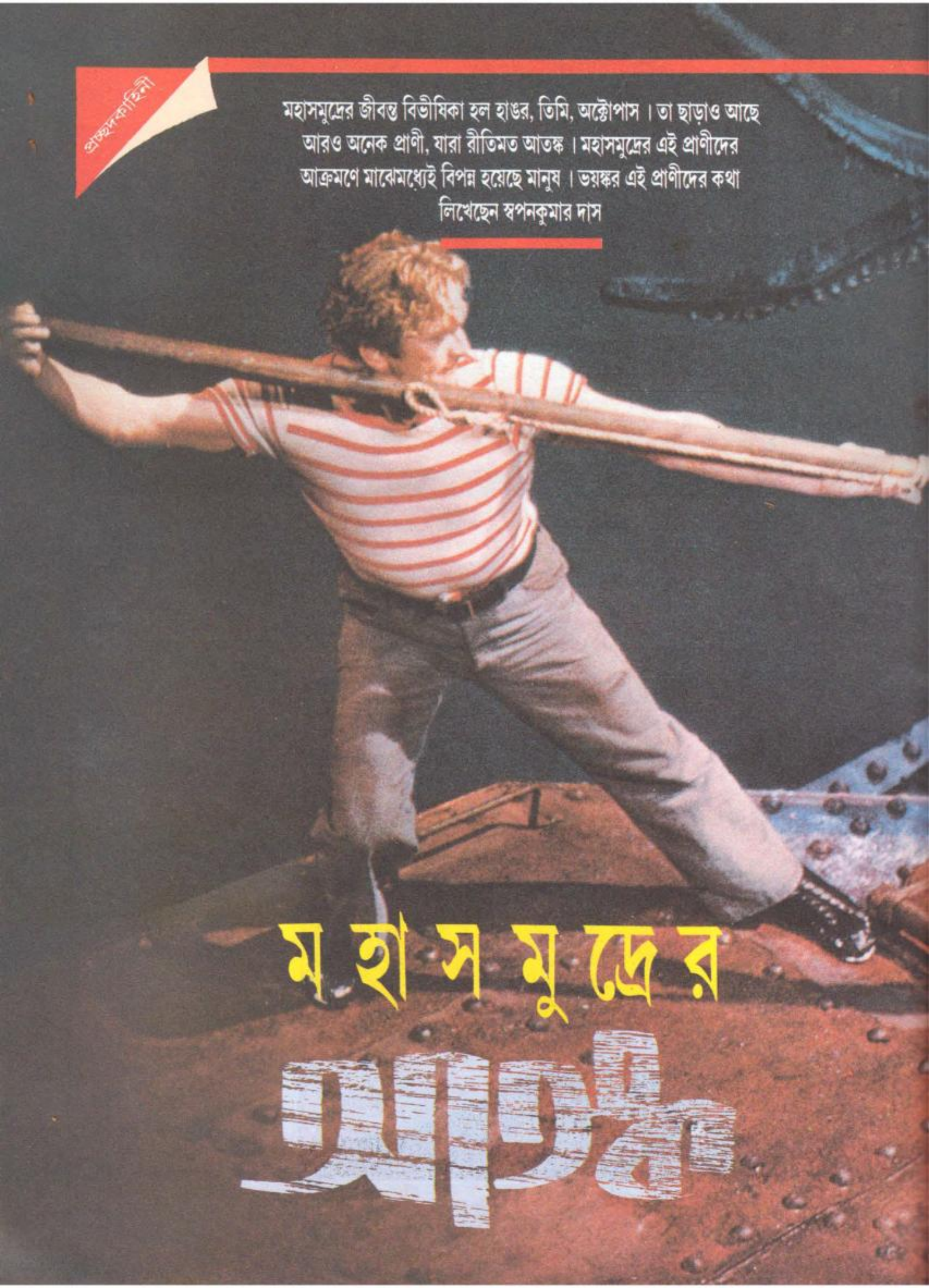

সব অক্টোপাসই ভয়ঙ্কর নয়, কিন্তু কারও কারও সামনে গেলে বিপদ

শঙ্কর মাছের লেজের ডগায় থাকে বিষাক্ত কাঁটা।
(নীচে), মহাসমুদ্রের আর এক আতঙ্ক—তিমি

মহাসাগরের জীবজন্তুদের নিয়ে মানুষের জল্পনা-কল্পনার শুরু সেই প্রাচীনকাল থেকে। প্রথম শতাব্দীতে প্রকাশিত রোমান প্রকৃতিবিদ প্লিনির 'হিস্ট্রি ন্যাচারালিস'-এ সাগর-দানবদের বিবরণ পাওয়া যায়। তবে এই ব্যাপারে সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন সুইডেনের ভৌগোলিক ওলেনাস ম্যাগনাস। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ম্যাগনাস নরওয়ের পূর্ব উপকূল থেকে গ্রিনল্যান্ড পর্যন্ত সমুদ্রবাসী দৈত্যদের হদিস জানিয়ে একটি ম্যাপ প্রকাশ করলেন। তবে এই দৈত্যেরা সবাই কিন্তু কল্পরাজ্যের বাসিন্দা।

মহাসাগরের সত্যিকারের বিভীষিকাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণীটির নাম হাঙর। প্রায় আড়াইশো প্রজাতির ছোট-বড় হাঙর ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রে। এদের মধ্যে সাতাশটি প্রজাতির হাঙর মানুষকে আক্রমণ করে। শুধুমাত্র 'গ্রেট হোয়াইট', 'ম্যাকো', 'টাইগার', 'হ্যামারহেডেড' এবং 'গ্রে'— এই পাঁচটি প্রজাতির হাঙরের মুখে প্রতি বছর প্রাণ দেয় কয়েকশো মানুষ। আর হাত-পা হারিয়ে কোনওক্রমে প্রাণ নিয়ে ফেরে আরও কয়েকশো মানুষ। একটি লোকের নাম থরসিস, প্রাচীন গ্রিসের মানুষ ছিল সে।

পেশায় স্পঞ্জ সংগ্রহকারী ডুবুরি। তখনকার দিনে কৃত্রিম স্পঞ্জ বাজারে আসেনি। রাজা-বাদশাহদের ব্যবহারযোগ্য উৎকৃষ্ট মানের টার্কিস স্পঞ্জ পাওয়া যেত গ্রিসের উপকূলে। অন্যদিনের মতো ডিঙি নৌকো থেকে থরসিস জলে নেমেছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই জলের তলায় তোলপাড়, রক্তের ছোঁয়া লাগল নীল জলে, আর থরসিসের কোমরে বাঁধা দড়িতে পড়ল প্রচণ্ড টান। তাড়াতাড়ি সঙ্গীরা দড়ি টেনে তুলল থরসিসের অর্ধেকটা শরীর, কোমরের নীচের বাকি অংশটি রাক্ষুসে হাঙর কেটে নিয়েছে নিপুণভাবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, পশ্চিম ইউরোপের মানুষ এই রাক্ষুসে প্রাণীটিকে চিনত না পাঁচশো বছর আগেও। ষোড়শ শতাব্দীতে ওই অঞ্চলের মানুষ নিজের দেশের গণ্ডি ছেড়ে ভেসে পড়ে মহাসমুদ্রের বুকে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ

শীতল রক্তের প্রাণী হলেও হাঙরের আক্রমণে প্রতি বছর প্রাণ দেয় কয়েকশো মানুষ। (নীচে), আকারে খুদে অক্টোপাসের বিষই সবচেয়ে মারাত্মক

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হাঙরের তাণ্ডব

এই শতাব্দীর দুটি ভয়াবহ ঘটনা 'গিনেস বুক অব রেকর্ডস' বইয়ের পাতায় জায়গা পেয়েছে। প্রথমটির ঘটনাস্থল দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালের উপকূল থেকে আটচল্লিশ কিলোমিটার দূরে ভারত মহাসাগরে। ১৯৪২ সালের ২৮ নভেম্বর ছ' হাজার সাতশো ছিয়ানব্বই টনের লিভারপুল স্টিমার 'নোভাস্কোটিয়া'কে একটি জার্মান 'ইউ বোট' টর্পেডো ছুঁড়ে ডুবিয়ে দেয়। জাহাজে সাতশো পঁয়ষট্টিজন ইতালিয়ান যুদ্ধবন্দী সমেত ন'শোজন যাত্রী ছিল। মাত্র সাত মিনিটের মধ্যে নোভাস্কোটিয়া তলিয়ে যায়। ছুটে আসে হাঙরের পাল। ছিন্নভিন্ন করে ফেলে অসহায় মানুষগুলোকে। নীল সমুদ্রের রং বদলে হয়ে ওঠে রক্তের সাগর। কয়েক ঘন্টা পর এক পর্তুগিজ জাহাজ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় যাত্রীদের উদ্ধার করতে। মাত্র একশো বিরানব্বইজনকে তারা খুঁজে পায়। বাকি সকলের মৃতদেহ নিয়ে তখনও টানাটানি করছিল হাঙরের দল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে একটি স্টিমার ঘূর্ণিঝড়ে ডুবে যায় সন্দীপের চরের কাছে। স্টিমারটিতে যাত্রী ছিল একশো নব্বইজন। এর মধ্যে পঞ্চাশজন হাঙরের শিকার হয়।

সমুদ্রে আসার পরেই হাঙরের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে।

প্রথম দিকে ইংরেজরা হাঙরকে বলত 'ট্রাইবুরন'। শব্দটি তারা পেয়েছিল স্পেনীয়দের কাছ থেকে। অভিযাত্রী এবং জলদস্যু হিসেবে স্পেনীয়রা অনেক আগেই মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি জমাতে শুরু করে। ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের এক প্রদর্শনীতে বিশাল এক হাঙর দেখা যায়। প্রাণীটির পরিচয়পত্রে জার্মান ভাষায় নাম লেখা ছিল 'সার্কে' (Schurke)। তার থেকেই এর ইংরেজি নাম হল সার্ক।

উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু ছাড়া হাঙর অল্পবিস্তর সব সমুদ্রেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু হাঙরের উপদ্রব বেশি ২১° উত্তর থেকে ২১° দক্ষিণ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। এই অঞ্চলে বছরের সব ঋতুতেই হাঙর মানুষ মারে। এই ভৌগোলিক সীমার বাইরে যদিও বা হাঙরের

সামুদ্রিক সাপেরা সবাই বিষাক্ত

উপদ্রব ঘটে, তা শুধু গরমের মাস ক'টাতেই সীমাবদ্ধ থাকে।

দেখা গেছে, গ্রিসের উপকূল, পোর্ট সৈয়দ এবং জেনোয়ার কাছাকাছি বিপজ্জনক হাঙরের ঘোরাফেরা বেশি। পশ্চিম গোলার্ধের হাঙর অধ্যুষিত অঞ্চল নিউ জার্সি থেকে সাউথ অ্যাম্বয় পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব বা পশ্চিম— দুই গোলার্ধেই ৪২° দ্রাঘিমাংশের বাইরে হাঙরের আক্রমণের খবর পাওয়া যায় না।

কেন এমন হয় তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, 'শীতল রক্তের প্রাণী' হাঙর খুব ঠাণ্ডা জলে থাকতে চায় না। জলের উষ্ণতা যেখানে ২১° সেলসিয়াসের ওপরে, সেখানেই এদের বাস। ঠিক এ-কারণেই একটু বেশি ঠাণ্ডা অঞ্চলে হাঙর শুধুমাত্র গরমকালেই দৌরাত্ম্য চালায়।

ভয়ঙ্কর প্রজাতির হাঙর নিজের সীমানা সযত্নে রক্ষা করে একটু অদ্ভুত উপায়ে। এদের মাথার সামনের সুচলো অংশে ছড়ানো আছে সূক্ষ্ম এক সংবেদ-অঙ্গ— 'অ্যাম্পুলা অব

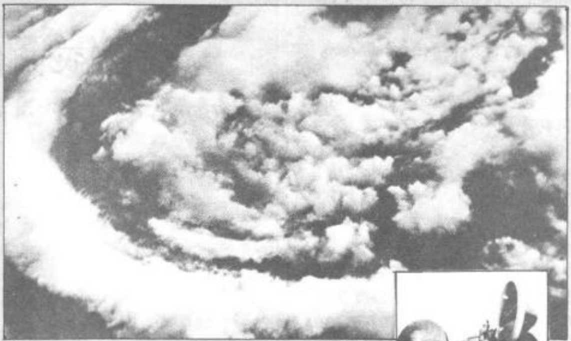

হারিকেনের জন্য ঘুরন্ত মেঘের কুণ্ডলী। (ইনসেট) ঝড়ের গতিবেগ মাপার যন্ত্র 'কাপ অ্যানোমোমিটার'

হারিকেনের কিছু বিশ্বরেকর্ড

২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬: হারিকেনের ঝোড়ো হাওয়ার সর্বোচ্চ রেকর্ড ঘন্টায় ৩১৭ কি· মি·। অতলান্তিক মহাসাগরের উত্তরে উৎপত্তি এবং গাল্‌ফ অব মেক্সিকোতে বিলয় ৩ অক্টোবর ১৯৬৬।

৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর, ১৯৭১: সবচেয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী হারিকেন। প্রায় ৩১ দিন। এর কেন্দ্রের ব্যাসও একটি রেকর্ড—প্রায় ১২৯ কি· মি·। সুতরাং ঝড়ের পরিধি যে কী বিশাল, তা নিশ্চয়ই অনুমেয়।

২১ অগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬: সবচেয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার রেকর্ড। শুরু আফ্রিকার পশ্চিম দিক থেকে আর শেষ উত্তর মেরুর কাছাকাছি। এই পথ পেরোতে এর সময় লেগেছে ২৬ দিন।

১৪ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭: উত্তর অতলান্তিকের একই অঞ্চলে একসঙ্গে তিনটি আলাদা হারিকেনের সৃষ্টি।

২৭ জুন ১৯৫৭: জুন মাসে সাধারণত হারিকেনের তীব্রতা খুব বেশি হয় না। এই হারিকেনটি সবচেয়ে বড় ব্যতিক্রম। ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ঘন্টায় ২১৭ কি· মি·।

১৯৭৯ সালে হারিকেন-বিধ্বস্ত আলাবামার একটি দ্বীপ

লরেঞ্জিনি'। এই অঙ্গের সাহায্যে হাঙর সৃষ্টি করে এক চৌম্বকক্ষেত্র। কোনও প্রাণী এই চৌম্বকক্ষেত্রে ঢুকে পড়লেই হাঙরটি তেড়ে এসে আক্রমণ করে।

এই চৌম্বকক্ষেত্রে কেউ একবার ঢুকে পড়লেই অনেকদূর থেকে হাঙর বুঝতে পারে। তখন অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে সাঁতরে আসে। প্রথমে শিকারকে ঘিরে পাক খায়। গোড়ার দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে, তারপর ক্রমশ ছোট বৃত্তে পাক খেতে থাকে। শেষে একটু কাত হয়, খুলে যায় তার ভয়ঙ্কর চোয়াল। ঝলসে ওঠে সারবাঁধা ছুরির মতো তীক্ষ্ণ দাঁত। হঠাৎ এক ঝটকায় কেটে নেয় এক খাবলা মাংস। রক্তের স্রোত মিশে যায় সমুদ্রের জলে। রক্তের গন্ধে বহু দূর থেকে ছুটে আসে আরও একঝাঁক হাঙর। ঘ্রাণশক্তির তীক্ষ্ণতায় অন্য কোনও প্রাণী এদের ধারেকাছে আসে না।

বিষাক্ত গ্লোবফিশ

কোন জাতের হাঙর আক্রমণ করেছে, তা সব-সময়ে ঠিকঠাক বলা যায় না। তবে অনেক ক্ষেত্রে ঘাতক নিজের পরিচয় রেখে যায়। ক্ষতস্থানের গভীরে মাংসের স্তরে গেঁথে থাকে ভাঙা দাঁতের টুকরো।

অজানা কোনও কারণে এক-একটি হাঙর বেছে নেয় এক-একটি এলাকা। এটাই তার শিকারভূমি। তার ধরনধারণ হয়ে ওঠে মানুষখেকো বাঘ বা পাগলা হাতির মতো। একে বলা হয় 'রোগ সার্ক'। দিনের পর দিন সে তাণ্ডব চালিয়ে যেতে থাকে, যতক্ষণ না তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। এমন এক হাঙরের কথা মাথায় রেখেই বিখ্যাত উপন্যাস 'জস'-এর সৃষ্টি হয়েছে।

হাঙরের উপদ্রব কমাতে কত যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সমুদ্র সৈকতে ঢালা হয়েছে কপার অ্যাসিটেট এবং ব্ল্যাক নিগ্রোসিনের মতো রাসায়নিক। ফুটো করা নল থেকে ছাড়া হয়েছে বুদ্বুদের রাশি। যাতে বুদ্বুদের জাল দেখে হাঙর পালায়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। এখন বিপজ্জনক

সমুদ্রের বিভীষিকা

সাইক্লোন, হারিকেন, টাইফুন নিয়ে লিখেছেন **চঞ্চল পাল**

মহাসাগরের আতঙ্কের কথা বলতে গেলে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কথা বলতেই হবে। প্রকৃতির এই তাণ্ডবের কাছে মানুষের প্রযুক্তিজ্ঞান আজও বড় অসহায়।

পৃথিবীর বিশেষ-বিশেষ অঞ্চল জুড়ে একটি নির্দিষ্ট বায়বীয় চাপ লক্ষ করা যায়। সারা বছর এই নির্দিষ্ট চাপের তারতম্য খুব বেশি হয় না। মাঝে-মাঝে সামান্য হেরফের হলেও সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলে এই বিভিন্ন চাপের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। তা সত্ত্বেও কখনও-কখনও হঠাৎ এর ব্যতিক্রম ঘটে আর তখনই শুরু হয় উপদ্রব। অর্থাৎ, কোনও এক অঞ্চলে বায়বীয় চাপ হঠাৎই খুব কমে যায়। তখন এই নিম্নচাপের ঘাটতি পূরণ করার জন্য আশপাশের অঞ্চল থেকে বাতাস হু-হু করে বয়ে আসে এবং নিম্নচাপের অঞ্চলকে ঘিরে সেই বাতাস ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণন বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে নিম্নচাপও ঘনীভূত হয়। শেষ পর্যন্ত তা এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। ঠিক কখন ও কোন জায়গায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হবে তার পূর্বাভাস দেওয়া এখনও মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হওয়ার পর তা কোনদিকে এগোচ্ছে এবং তার রূপ কীরকম, তার কিছুটা আভাস দেওয়া সম্ভব।

বাতাসের গতিবেগকে 'বোফর্ট স্কেল' অনুযায়ী বারোটি ভাগ করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে ঘুরন্ত হাওয়ার গড় গতিবেগ শেষ পাঁচটি (৮ থেকে ১২) ভাগের মধ্যে পড়লে তাকে বলা হয় 'সাইক্লোন'। এই হিসেব অনুযায়ী ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটারের বেশি গতিবেগ সম্পন্ন ঝোড়ো হাওয়াকেই সাইক্লোন বলা যাবে। তবে এর চূড়ান্ত পর্যায় স্কেলের শেষ অংশটি, যার হাওয়ার বেগ ঘণ্টায় ১১৯ কিলোমিটারের বেশি। তখন এর নাম হয় হারিকেন। অবশ্য এই ঘূর্ণিঝড় যদি অতলান্তিক মহাসাগরের পশ্চিমাংশে বা ক্যারিবিয়ান সাগরে উৎপন্ন হয় তা হলেই তাকে এই নামে ডাকা হয়। কিন্তু এই ঘূর্ণিঝড়ই যদি প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিমাংশে সৃষ্টি হয় তা হলে এর নাম হয়ে যাবে টাইফুন। আবার অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম মহাসাগরে

ঠাণ্ডা ও গরম হাওয়ার মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় যেভাবে সাইক্লোনের সৃষ্টি হয়

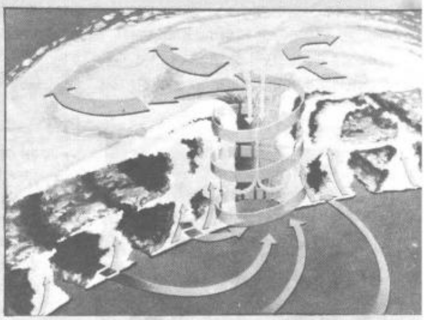

সাইক্লোনের আক্রমণে লন্ডনের বিধ্বস্ত বাড়িঘর, ৬ জানুয়ারি, ১৯২৮

উৎপন্ন এই ঘূর্ণিঝড়ের নাম 'উইলি-উইলিস'।
অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, হারিকেন বা টাইফুন জন্ম নেয় সাধারণত বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণে মাত্র ১০ থেকে ৩০ ডিগ্রি অক্ষাংশের মধ্যে। আবার এই অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা হচ্ছে ভারত মহাসাগর, ক্যারিবিয়ান সি, গালফ অব মেক্সিকো, দক্ষিণ চিন সমুদ্র এবং পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি সমুদ্রোপকূল। তা ছাড়া, দেখা গেছে যে, গ্রীষ্ম আর শরৎকালই হারিকেনের সবচেয়ে প্রিয় ঋতু।
এক-একটি হারিকেনের গড়পড়তা আয়ু হচ্ছে ৯ দিন। সামগ্রিকভাবে এগিয়ে যাওয়ার এর একটি নিজস্ব গতিবেগ থাকে, যার গড়পড়তা হিসেব হল ঘণ্টায় ১২ কিলোমিটার। আগে যে গতিবেগের কথা বলা হয়েছে, তা কিন্তু ঘুরন্ত বাতাসের গতিবেগ। তার সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের নিজস্ব গতিবেগকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। হারিকেন প্রথম থেকেই সাধারণত পশ্চিম দিকে এগোতে থাকে, তারপর একটা গোত্তা খেয়ে আবার পূর্বদিকে এগিয়ে চলে। যতই তারা উপকূলের কাছাকাছি আসে, ততই তাদের প্রকোপ কমতে থাকে। উপকূলে ঝাঁপিয়ে পড়েই তাদের শক্তি দ্রুত শেষ হয়ে যায়। এই অবস্থাতেই তারা উপকূলবর্তী জায়গাগুলিতে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে।
হারিকেনের কেন্দ্রের ব্যাস সাধারণত থাকে ১০-১১ কি· মি· জুড়ে। এই অঞ্চলটা অপেক্ষাকৃত শান্তই বলা চলে। কারণ এখানে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ২৪ কি· মি-র বেশি হয় না। এই কেন্দ্রের বাইরে ২৪ থেকে ৪০ কি· মি· দূর পর্যন্ত ঘুরন্ত বাতাসের তাণ্ডব তথা গতিবেগ থাকে সর্বোচ্চ। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা ও মেঘপুঞ্জ ঘুরন্ত হাওয়ার টানে আকর্ষিত হয়ে ঘুরতে থাকে, কিন্তু কেন্দ্রে একটুও মেঘ জমতে পারে না।
হারিকেন স্থলভূমিতেও জন্ম নিতে পারে, আর তার তাণ্ডব একই রকম ভয়ঙ্কর। তবে তার প্রভাব সমুদ্রের ওপর বেশিদূর পর্যন্ত পৌঁছয় না।
ঘূর্ণিঝড় ছাড়া সমুদ্রের বুকে আর-এক ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক কাণ্ড হচ্ছে ঘূর্ণায়মান জলস্তম্ভ। এর আবির্ভাবের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও আজ পর্যন্ত নিখুঁতভাবে মেলেনি। ১৭৭৯ সালের ২ জুন। স্কটল্যান্ডের আবেরডিনশায়ারের উপকূলে বসে ছিলেন স্নানার্থীরা। হঠাৎ তাঁরা দেখলেন, সমুদ্রের মাঝখানে একটা জলস্তম্ভ স্প্রিংয়ের মতো ওপরে উঠে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আবার জলের ওপর নেমে এল। তারপর আবার একটা লম্বা জলস্তম্ভ ওপর দিকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল।
এই জলস্তম্ভের পোশাকি নাম 'সি মনস্টার' বা 'ওয়াটার ডেভিল'। সমুদ্রের একটি অংশ যদি হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তা হলে গরম হাওয়া দ্রুত ওপর দিকে উঠে যাবে। এই সময় অত্যধিক ঠাণ্ডা হাওয়া যদি পাশ থেকে এগিয়ে আসে তা হলে এই দুইয়ের প্রতিক্রিয়ায় বাতাসে তৈরি হবে ঊর্ধ্বমুখী ঘূর্ণি। এর ফলেই জলকণাও হঠাৎ সবেগে ওপর দিকে উঠে যেতে পারে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টানে এই স্তম্ভ দ্রুত নেমে পড়ে।
সমুদ্রদৈত্যের অন্য এক রূপ 'ওয়াটার স্পাউট'। একে দেখতে ঠিক ফানেলের মতো।
এই জলস্তম্ভের স্থায়িত্ব বড় জোর ২০ মিনিট। তবে এই ঘূর্ণি বাতাস ও মেঘ যদি স্থলভূমির ওপর সৃষ্টি হয় তা হলে তা ছোটখাটো প্রলয় বাধিয়ে দিতে পারে। তখন একে বলা হয় 'টর্নাডো'। আবার জলে উৎপন্ন হয়েও তা স্থলে এসে আঘাত করতে পারে। ১৯৭৫ সালে ২২ অগস্ট ইংল্যান্ডের এসেক্স উপকূলে একটি নৌকো পড়েছিল এই ওয়াটার স্পাউটের কবলে। সঙ্গে-সঙ্গে জলস্তম্ভের ভেতর দিয়ে নৌকোটা ঘুরতে-ঘুরতে ৪৫০ ফুট ওপরে উঠে গিয়েছিল।
এসব তো গেল সমুদ্রের ওপরের আতঙ্ক। সমুদ্রের তলায় ডুবোপাহাড় ও আগ্নেয়গিরিও সাগরপাড়ির ক্ষেত্রে কম বিপজ্জনক নয়।

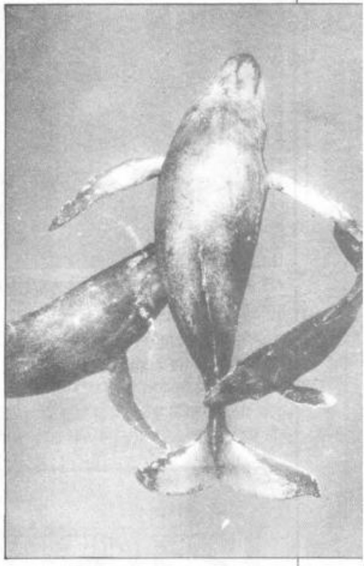
তিমিকে ভয় পায় না এমন প্রাণী কমই আছে

জায়গাগুলোকে ঘিরে ফেলা হয়েছে তারের জালে। রক্ত-মাংসলোভী হাঙরের আক্রমণ থেকে বাঁচতে এটাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপায়।
হাঙরের সগোত্র আর-এক মৎস্য-দানবের নাম 'স্টিংরে'। হাঙরের মতো এরা (বাংলায় এদের শঙ্কর মাছ বলে) তেড়ে এসে আক্রমণ করে না বা ধারালো দাঁতের কামড়ে মাংসও তুলে নেয় না। কিন্তু এদের কাঁটার ছোবল খেলেই সর্বনাশ। গোলাকার চ্যাপটা শরীর নিয়ে সাগরের তলায় বালির মধ্যে লুকিয়ে থাকে স্টিংরে। শিকার কাছাকাছি এসে পড়লেই চাবুকের মতো লেজের বাড়ি কষায়।
এদের লম্বা সরু লেজের ডগায় উঁচিয়ে থাকে বিষাক্ত কাঁটা। কাঁটার তলায় থাকে বিষগ্রন্থি। বেশিরভাগ স্টিংরে আয়তনে এক মিটারের কম হয়ে থাকে। এদের বিষাক্ত কাঁটা লম্বায় সাত থেকে দশ সেন্টিমিটারের মতো। ক্যাপ্টেন কুক অস্ট্রেলিয়ার কাছে এক দৈত্যাকার স্টিংরে দেখেন, যার লাতিন নাম 'ড্যাসিয়াটিস ব্রেভিকডাটা'। দু' মিটার আয়তনের এ-মাছের কাঁটা আটত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। উষ্ণমণ্ডলের সব সমুদ্রেই স্টিংরে-র ছোবলে

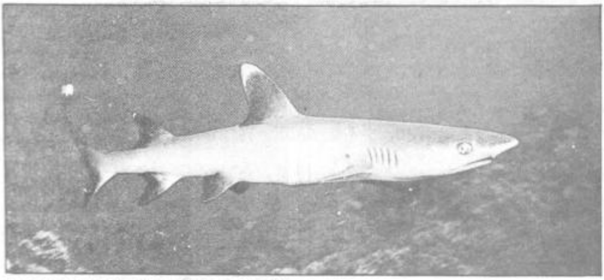

প্রায় আড়াইশো প্রজাতির হাঙর ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর নানা সমুদ্রে

দুর্ঘটনা ঘটে। একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই প্রত্যেক বছর হাজার দেড়েক মানুষ স্টিংরে-র কাঁটার আঘাত খায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তেমন মারাত্মক কোনও ঘটনা ঘটে না। কিন্তু বুকে বা পেটে কাঁটা ফুটলে মৃত্যু অনিবার্য। দুটি মাছের নামে নাবিক, ডুবুরি এবং জেলেরা ভীষণ ভয় পায়। মাছ দুটি হল— পিরান্‌হা আর ব্যারাকুডা। এর মধ্যে পিরান্‌হাকে মহাসমুদ্রের বিভীষিকা বলা যায় না। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন আর সাওফ্রানসিসস্কো নদীতে এদের বসবাস। মিষ্টি জলের মাছ পিরান্‌হা সমুদ্রের নোনা জলে বাঁচে না। ব্যারাকুডাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাসিন্দারা হাঙরের চেয়ে বেশি ভয় পায়। তিন প্রজাতির ব্যারাকুডার মধ্যে আধ মিটার মাপের 'স্মল ব্যারাকুডা'র বাস উত্তর আমেরিকার কাছাকাছি অতলান্তিক মহাসাগরে। পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে ভয়ঙ্কর 'গ্রেট ব্যারাকুডা'র বাস। লম্বায় এরা আড়াই মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভূমধ্যসাগরেও দেড় মিটার লম্বা মাঝারি আয়তনের ব্যারাকুডার দেখা পাওয়া যায়। এদের মধ্যে গ্রেট ব্যারাকুডাই মহাসমুদ্রের আতঙ্ক হিসেবে পরিচিত।
ব্যারাকুডা পারসে-ভাঙ্গন জাতের মাছ। শক্ত কাঠামোর লম্বা দেহের তুলনায় এদের মাথাটি বেশ বড়। শক্তিশালী চোয়ালে তীক্ষ্ণ ছোরার মতো দাঁতের সারি। কোনও কিছু এর সামনে বেশি নড়াচড়া করলে ব্যারাকুডা সঙ্গে-সঙ্গে তাকে আক্রমণ করে, ধারালো দাঁতে নিপুণভাবে কেটে নেয় মাংসের ফালি।

তিমির পেটে জীবন্ত মানুষ

তিমির পেটের মধ্যে কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে? তাও আবার এক-আধ মিনিট নয়, অন্তত বারো-চোদ্দ ঘণ্টা। কথাটি যতই অবিশ্বাস্য মনে হোক, তিমি-শিকারি জেমস বার্টলি সত্যি-সত্যি তিমির পেট থেকে জীবন্ত ফিরে এসেছিলেন। ১৮৯১ সালের ২৫ অগস্ট বিকেলের দিকে তিমি-শিকারি জাহাজ 'স্টার অব দ্য ইস্ট' ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জের কাছে অতিকায় এক স্পার্ম-তিমির দেখা পেল। যথারীতি জাহাজ থেকে ছুটে গেল হারপুন, গেঁথে গেল তিমিটির গায়ে। সবাই যখন ভাবছে তিমিটি প্রাণের ভয়ে পালাবে, তখনই তিমিটি ঘুরে জাহাজটিকে আক্রমণ করল। তার চোয়ালের চাপে জাহাজ ভেঙে দু' টুকরো। জাহাজের সকলেই ছিটকে পড়ল জলে। কাছেই ছিল আর-এক সহযোগী শিকারি জাহাজ। এগিয়ে এল সাহায্য করতে। একে-একে সকলকেই পাওয়া গেল। শুধু বার্টলির খোঁজ পাওয়া গেল না। সবাই ভাবল, বার্টলি নিশ্চয় জলে তলিয়ে গেছেন।

ওদিকে তিমিটিও তখন বেশ কাবু হয়ে পড়েছে। অন্য জাহাজটি থেকে আর-একবার হারপুনের আঘাত আর সামলাতে পারল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেসে উঠল তার মৃতদেহ। মরা তিমিটাকে জাহাজে তুলে কাজে লাগল সকলে। সমস্ত রাত গড়িয়ে গেল তিমির চর্বি আর মাংস কাটতে। পরের দিন সকালে সূর্য বেশ খানিকটা উঠে গেছে, তিমির পাকস্থলী ব্যবচ্ছেদে ব্যস্ত সকলে। কুড়ুলের আঘাতে চিরে গেল পুরু মাংসের দেওয়াল। চমকে উঠলেন সবাই, পাকস্থলীর ভেতরে আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছেন জেমস বার্টলি। নির্জীব কিন্তু বেঁচে রয়েছেন।
এতক্ষণ ধরে তিমির পাকস্থলীতে থাকার ফলে বার্টলির শরীরে পরিবর্তন হয়েছে শুধু গায়ের রং। মুখ, হাত, পা, চুল—শরীরের সমস্ত অংশের রং হয়ে গেছে চক-খড়ির মতো সাদা। পাকস্থলীর জারক রসে থাকা তীব্র হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জন্যই এই বিপত্তি।
সুস্থ হওয়ার পর বার্টলি তাঁর রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন, "কখন যে এই অদ্ভুত অন্ধকার গুহায় এলাম, বুঝতে পারছি না। গুহার দেওয়াল কেমন যেন নরম এবং নড়ছে। একবার এগিয়ে আসে, আবার পিছিয়ে যায়। কী ভীষণ জ্বালা শরীর জুড়ে, আর কী প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। তারপর ভাবতে পারছি না, এবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি ... চারদিকে আরও আরও, অন্ধকার।"
তিমির পেট থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসে পেটের ভেতরের বর্ণনা দিতে পেরেছেন ওই একজনই। আর-একবার এক আর্জেন্টিনার নাবিকের মৃতদেহ পাওয়া যায় তিমির পেট চিরে।

অক্টোপাস-দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ

১৯৪৪ সালের মে মাসের এক পরিষ্কার দিন। ডুবুরি র‍্যালফ উড ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার 'জুয়ান-ডি-ফুকো' প্রণালীর কাছে জলে নেমেছেন। দিব্যি এদিকে-ওদিকে সাঁতরাচ্ছেন। হঠাৎ এক দৈত্য অক্টোপাস শুঁড়ের পাকে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। উড ছিলেন শক্তিশালী পুরুষ। কোমরে-গোঁজা ছোরাটি খুলে তিনিও লড়ে গেলেন। একে-একে কেটে ফেললেন অক্টোপাসের ক'টি শুঁড়। কিছুক্ষণের মধ্যে অক্টোপাসটি রণে ভঙ্গ দিল। উড তিনটি কাটা শুঁড় নিয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরে এলেন। শুঁড়গুলোর মাপমতো অক্টোপাস-দৈত্যটির দেহের ব্যাস অনুমান করা যায়—কমপক্ষে চার মিটার।

একই রকম দুর্ভাগ্য হয়েছিল ফ্র্যাঙ্ক কনট্রিমের সানফ্রানসিসকোর সৈকতের কাছে। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাসে কনট্রিম এবং তাঁর বন্ধু হ্যারি সিমন্স জলে নেমেছিলেন ঝিনুক তুলতে। পাথরের খাঁজ থেকে বাঁকানো ছুরি দিয়ে ঝিনুক তুলছেন আর কোমরে ঝোলানো ঝুড়িতে রাখছেন। খেয়াল নেই কখন অক্টোপাসের গুহার সামনে এসে পড়েছেন কনট্রিম। যখন সংবিৎ ফিরল, ততক্ষণে তাঁর দুটি পা আর বাঁ হাত অক্টোপাসের নাগপাশে বাঁধা পড়েছে। পাগলের মতো ঝিনুক-তোলা ছুরিটা চালাতে লাগলেন কনট্রিম। সিমন্স ছিলেন কিছুটা দূরে। বন্ধুর দিকে চোখ পড়তে শিউরে ওঠেন। তাড়াতাড়ি সাঁতরে আসেন ঘটনাস্থলে। তারপর দু'জনে মিলে বহুক্ষণ লড়াই করে অক্টোপাসটিকে মেরে ফেলেন। এক ফাঁকে ক্ষণিকের সুযোগে সিমন্স সোজা ছুরি চালিয়ে দিলেন অক্টোপাসটির দু' চোখের মাঝখানে। মোক্ষম আঘাত লাগল অক্টোপাসের মস্তিষ্কে, সঙ্গে-সঙ্গে নেতিয়ে পড়ল।

কনট্রিম আর সিমন্স কোনওক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অক্টোপাসের মৃতদেহ জলে ভাসল। শুঁড়সমেত দৈত্যটির দেহের ব্যাস ছিল সাড়ে চার মিটারের একটু বেশি। ওজন ছিল সাড়ে উনিশ কেজি।

ওয়াশিংটনের ডুবুরি ডোনাল্ড হেগেনের কৃতিত্ব আরও বেশি। পৌনে চার মিটার ব্যাসের এবং চুয়াম কেজি ওজনের একটি দৈত্য অক্টোপাসকে জীবন্ত অবস্থায় ধরেন হেগেন। আজ পর্যন্ত পাওয়া অক্টোপাসের মধ্যে এটিই সবচেয়ে ওজনদার। ১৯৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি লোয়ার হুডস ক্যানাল থেকে তিনি এই দৈত্য অক্টোপাসটিকে ধরেন।

সাঁতার কাটার সময় ডুবুরির হাত-পা নাড়া ব্যারাকুডাকে আকর্ষণ করে। তা ছাড়া উজ্জ্বল রংও আকর্ষণ করে এ-মাছকে। রঙিন সাঁতারের পোশাক পরে জলে নামলে বিপদ বাড়ে। হাঙরের কিন্তু কোনও রঙেই আকর্ষণ নেই।

অদ্ভুত এক রহস্য ব্যারাকুডাকে ঘিরে আছে, যার কিনারা করা আজও মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডুবুরিরা প্রায়ই ব্যারাকুডার শিকার হয়। অথচ প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জের, বিশেষত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের কোনও সাঁতারু বা ডুবুরিকে ব্যারাকুডা কখনও আক্রমণ করেনি। ডুবুরিরা এ-ব্যাপারে মুখ খুলতে চান না।

দুটি শামুক জাতীয় প্রাণী— 'জায়েন্ট স্কুইড' আর অক্টোপাস প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে আসছে। বিখ্যাত ছবি 'টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস আন্ডার দ্য সি'-তে দেখা গেছে ক্যাপ্টেন নিমোর ডুবোজাহাজ 'নটিলাস'কে জড়াচ্ছে একটি দৈত্য স্কুইড। দৈত্য স্কুইড সমুদ্রের একটু গভীর অঞ্চলে থাকে। সাড়ে চোদ্দ-পনেরো মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে এরা। এদের দেহ শঙ্কুর মতো এবং মাংসল, অন্য শামুকজাতীয় প্রাণীর

শঙ্কর মাছের সরু লেজের ডগায় থাকে বিষাক্ত কাঁটা, কাঁটার তলায় বিষগ্রন্থি। কাঁটা ফুটিয়েই মানুষকে সে ঘায়েল করে দেয়

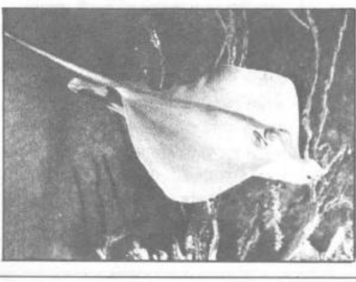

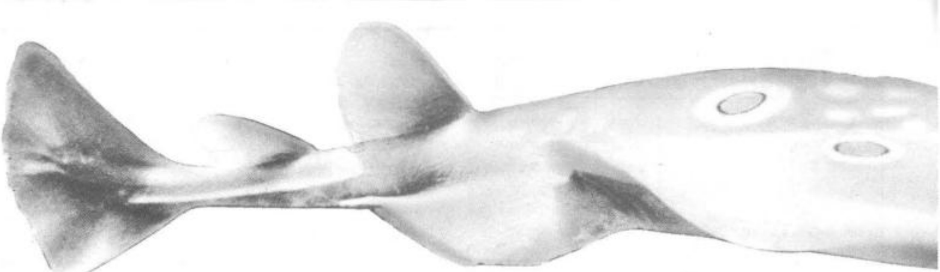

মোরে ঈল : সমুদ্রের আর এক আতঙ্ক

খুনে তিমিদের আস্তানা

ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সমুদ্রে খুনে তিমিরা থাকে দল বেঁধে। কোনও কোনও দলে ১৭৫টির মতো তিমিও দেখা যায়। এই তিমিদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। ওয়াশিংটন উপকূলেও এরা হানা দেয়। এদের মধ্যে কিছু তিমি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রের বড় প্রাণীদেরও শিকার করে। তখন বড় বড় সিল মাছও এদের আক্রমণে অসহায় হয়ে পড়ে।

মতো শক্ত খোলসে ঢাকা নয়। মাথাটি গোলাকার, সামনে বেরিয়ে থাকে দশটি শুঁড় আর নীচের দিকে একটি ফানেল। শুঁড়গুলোর মধ্যে আটটি সমান মাপের, লম্বায় দেহের সমান। বাকি দুটি লম্বায় অন্তত তিন গুণ বড়। অবশ্য মেয়ে স্কুইডের লম্বা শুঁড়ের দৈর্ঘ্য পুরুষ স্কুইডের থেকে কম। মাথার দু'পাশে থাকে বড়-বড় দুটি চোখ। শুঁড়েই এদের যত শক্তি। প্রতিটি শুঁড়ের ভেতর দিকে থাকে অসংখ্য বড়-বড় 'সাকার' বা 'চোষক'। স্কুইড শুঁড় দিয়ে শিকারকে জড়িয়ে ধরে। তারপর শিকারের গায়ে চেপে বসে সাকারের বজ্র-আঁটুনি।

হাঙরের সগোত্র আর-এক মৎস্য-দানবের নাম 'স্টিংরে'। হাঙরের মতো এরা (বাংলায় এদের শঙ্কর মাছ বলে) তেড়ে এসে আক্রমণ করে না বা ধারালো দাঁতের কামড়ে মাংসও তুলে নেয় না। এদের কাঁটার ছোবল খেলেই সর্বনাশ।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জাতের স্কুইড হল 'ডসিডিসকাস জাইগাস'। এদের দেখা পাওয়া যায় পেরুর কাছাকাছি সমুদ্রে। সাড়ে তিন মিটার লম্বা এবং দেড়শো কেজি ওজনের প্রাণীটি স্বপ্রজাতির অন্য দৈত্যের তুলনায় বেশ ছোট। কিন্তু হিংস্রতায় এর জুড়ি মেলা ভার। সমুদ্রের ওই অঞ্চলে কোনওক্রমে কেউ একবার জলে পড়লে হয়। এই দৈত্যের মুখ থেকে তার নিস্তার পাওয়ার উপায় নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মানুষটির বদলে জলে ভাসে মাংসপিণ্ড।
অক্টোপাসের ইংরেজি নাম 'ডেভিল ফিশ'। কিন্তু একশো পঞ্চাশ প্রজাতির অক্টোপাসের মধ্যে অধিকাংশই তত ভয়ঙ্কর নয়। এরা পারতপক্ষে মানুষের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ এড়িয়ে চলে। এদের কিম্ভূতকিমাকার দেহ, বড়-বড় চোখ আর সাকার-আঁটা, কিলবিল করা শুঁড়— সব মিলিয়ে অক্টোপাস সাগরতলের দৈত্য হয়ে উঠেছে।
অক্টোপাসের দেহ কিছুটা থলথলে, মোটামুটি গোলাকার। দরকারমতো এরা নিজেদের আকৃতি কিছুটা বদলও করতে পারে। স্কুইডের মতোই এদের গোল মাথার দু'পাশে আছে দুটি বড় চোখ আর সামনে আটটি শুঁড়। শুঁড়ের সংখ্যা আট বলেই প্রাণীটির লাতিন নাম রাখা হয়েছে অক্টোপাস। এরও আছে ফানেল আর মুখে শক্তিশালী চোয়াল। সাগরজলের গভীরে পাথরের খাঁজে বা চোরা পাহাড়ের গুহায় বাসা বাঁধে এরা। তবে দরকার হলে ঠিক স্কুইডের মতো ফানেল দিয়ে জলের জেট ছুঁড়ে সাঁতার দিতেও পারে। কোনও ডুবুরি অক্টোপাসের বাসার কাছে গিয়ে পড়লে প্রথমে অক্টোপাস ঘন কালির মতো পদার্থ ছুঁড়ে মারে। এই পদার্থটিকে বলা হয় 'ইঙ্ক'। অক্টোপাস আর স্কুইডের দেহে ইঙ্ক তৈরির জন্য বিশেষ একটি গ্রন্থি 'ইঙ্ক গ্ল্যান্ড' রয়েছে। চারপাশের জল হঠাৎ কালো হয়ে

যায় অক্টোপাসের ইঙ্কে। ডুবুরি ধাঁধায় পড়ে যায়, আর প্রাণীটিও সেই সুযোগে অন্যদিকে সরে পড়ে।
সামনে খুব বেশি নড়াচড়া করলেই অক্টোপাস তখন শুঁড় বাড়িয়ে জড়িয়ে নেয় ডুবুরিকে। সাকার এঁটে বসে গায়ে। এদের সাকার আরও শক্তিশালী। একবার এঁটে বসলে ছাড়ানো শক্ত। অতিকষ্টে যদিও-বা একটি শুঁড়কে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা যায়, আটটি শুঁড় কেটে অক্টোপাসকে কাবু করা প্রায় অসাধ্য। কাবু করার একমাত্র উপায় হল অক্টোপাসের মাথায় ছুরি বা বর্শা চালানো। তবু যদি অক্টোপাস পাথরের খাঁজে সাকার লাগিয়ে চেপে বসতে না পারে তো ডুবুরির কপাল ভাল। কিন্তু একবার চেপে বসলে আর পরিত্রাণ নেই। অবিশ্বাস্যরকম শক্তি এদের। মাত্র এক কেজি ওজনের একটি অক্টোপাস আঠারো কেজি ওজনদার কোনও বস্তুকে টেনে জলে ডুবিয়ে দিতে পারে।
অক্টোপাস কি কামড়ায়? অদ্ভুত শোনালেও ব্যাপারটা সত্যি। কয়েকটি প্রজাতির অক্টোপাস ধারালো চোয়াল দিয়ে কামড়ে দেয়। ক্ষতস্থানে এদের লালা মিশে কিছুটা জ্বালা-যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। তেমন মারাত্মক কিছু প্রতিক্রিয়া হয় না, যদি না অক্টোপাসটি সাঙ্ঘাতিক 'ব্লুরিংড' প্রজাতির হয়। ব্লুরিংড প্রজাতির অক্টোপাস কামড়ালে মৃত্যু অনিবার্য।
সাঁতার কাটতে গিয়ে অক্টোপাসের নাগপাশে জীবন দিয়েছেন মাত্র একজনই। অস্ট্রেলিয়ার এক তরুণ এভাবেই জীবন হারান। মৃতদেহ ভেসে উঠলে তার সমস্ত শরীর জুড়ে চাকা-চাকা সাকারের দাগই বলে দেয় মৃত্যুর কারণ।
মহাসমুদ্রের আর-এক আতঙ্কের নাম 'মোরে ঈল'। আড়াই মিটার লম্বা এই প্রজাতির বান মাছের বাস বিষুব অঞ্চলে। শক্তিশালী চোয়ালে সাজানো তীক্ষ্ণ কয়েক সারি দাঁত ভয়াবহ করে তুলেছে একে। উপরন্তু

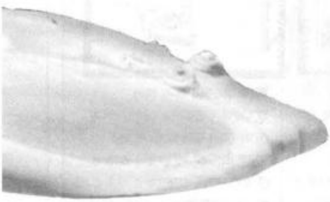

হাঙরের উপদ্রব কমাতে কত যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সমুদ্র সৈকতে ঢালা হয়েছে কপার অ্যাসিটেট এবং ব্ল্যাক নিগ্রোসিনের মতো রাসায়নিক। ফুটো করা নল থেকে ছাড়া হয়েছে বুদ্বুদের রাশি। যাতে বুদ্বুদের জাল দেখে হাঙর পালায়।

ডুবোজাহাজের শত্রু তরোয়াল মাছ

মহাসমুদ্রের গভীরে ভয়ঙ্কর প্রাণীদের হাত থেকে ডুবোজাহাজেরও নিস্তার নেই। সেখানে আছে ঘণ্টায় নব্বই কিলোমিটার বেগে ছুটে আসা 'তরোয়াল মাছ' বা 'জিফিয়াস গ্লেডিয়াস'। দুই থেকে তিন মিটার দৈর্ঘ্যের তরোয়াল মাছের মাথার সামনে বেরিয়ে থাকে লম্বা এক তরোয়াল। এই তরোয়াল মাপে শরীরের এক-তৃতীয়াংশ।
ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পুরনো দিনের কাঠের জাহাজের একটি টুকরো রয়েছে। টুকরোটির বিশেষত্ব হল—ছাপ্পান্ন সেন্টিমিটার গভীর এক গর্ত। গর্তটি আর কিছু নয়, তরোয়াল মাছের তরোয়ালের আঘাত।
কিছুদিন আগের ঘটনা। আমেরিকান ডুবোজাহাজ জর্জিয়ার কাছে ছ'শো মিটার গভীরে গবেষণার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এল এক বিশাল তরোয়াল মাছ, ডুবোজাহাজের ধাতব সন্ধিস্থলে চালিয়ে দিল তরোয়াল। এত গভীরে গেঁথে গেল তার তরোয়াল যে, বহুক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সে আর মুক্ত করতে পারল না। ডুবোজাহাজ ফিরে এল, সঙ্গে এল নব্বই কেজি ওজনের তরোয়াল মাছ। এই মাছের আচরণও অদ্ভুত।

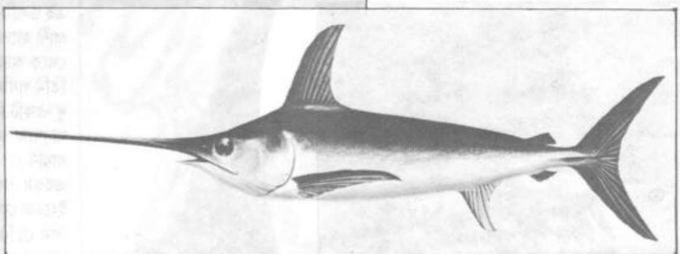

একা-একা ঘুরে বেড়ায়, স্কুইড, চিংড়িজাতীয় প্রাণী আর মাছ খেয়ে পেট ভরায়। কিন্তু জলের নীচে বড় মাপের কিছু দেখতে পেলেই হল। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে গোঁয়ারের মতো প্রচণ্ড গতিতে ছুটে গিয়ে চালিয়ে দেবে তরোয়াল। ডুবোজাহাজই হোক বা তিমি হোক, ভয় পায় না কিছুতেই। তিমির শরীরের পুরু চর্বিস্তরে গেঁথে থাকে ভাঙা তরোয়াল।
আসলে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসা তরোয়াল মাছ পাশ কাটাতে পারে না। পারে না নিজের গতি চট করে কমিয়ে আনতে। তাই সংঘর্ষ এড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হয় না।
তরোয়াল মাছের সগোত্র 'ম্যাকো হাঙর' আবার শত্রু ভাবে নৌকোকে। তিন মিটারের কাছাকাছি বিশাল আয়তনের ম্যাকোর প্রচণ্ড বদনাম আছে নৌকোতে ধাক্কা মারার জন্য। ঠিকমতো কায়দায় পেলে নৌকো উলটে যাত্রীদের দিয়ে মহাভোজে লেগে যায় ম্যাকো।
কল্পলোকের দৈত্যদানোর যুগ শেষ হয়ে গেছে কবেই। কিন্তু মহাসমুদ্রের এই বাস্তব বিভীষিকারাই বা কম কিসে? কীভাবে মহাসমুদ্রের গভীরে এদের আক্রমণ ঠেকানো যায়, তাই নিয়ে সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের ভাবনার শেষ নেই।

ডাকটিকিটও পিছিয়ে নেই

বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান ইউ-বোট ও সাবমেরিন সমুদ্রের আতঙ্ক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।
শুধু সাবমেরিনের আঘাতই নয়, মহাসমুদ্রের আতঙ্ক হল—ডুবোপাহাড়, জলদস্যু এবং বালির বিস্তৃত চড়া।
দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল বরাবর যেসব জাহাজডুবি হয়েছে, তাদের ধরে রাখা হয়েছে চারটি ডাকটিকিটে। যতদূর জানা যায় সেখানে প্রথম জাহাজডুবির ঘটনা ঘটে ১৮০৪ সালের ১৪ মে। ওলন্দাজদের তিমি শিকারের জাহাজ 'দ্য হোপ' দক্ষিণ আফ্রিকার হটেনটট উপজাতি দস্যুদের আক্রমণে সমুদ্রের মাঝেই পরিত্যক্ত হয়। নাবিকরা নিহত হন।
এখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও বলি হয়েছে অনেক জাহাজ। ১৮৮৪ সালের ২২ অক্টোবর 'দ্য টিলি' নামে একটি জাহাজ উত্তর সাগরে

প্রচণ্ড ঝড়ের সম্মুখীন হয়। বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে বন্দরের কাছে এসেও আচমকা এক ঘূর্ণিঝড় জাহাজকে নিয়ে গিয়ে ডুবোপাহাড়ে ধাক্কা দেয় ও বিধ্বস্ত হয়।
'এডওয়ার্ড বোজলেন' নামে একটি জার্মান জাহাজ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় ডাক নিয়ে যাওয়ার জন্য চালু হয়েছিল। একদিন ভোরবেলায় দেখা গেল জাহাজটি বালির চড়ায় আটকা পড়েছে। আজও সেখানে সেই জাহাজের ধ্বংসাবশেষ বালির চড়ায় দেখতে পাওয়া যায়।

কবিতা রায়

ক্ষতস্থানে বিষও ঢালে মোরে ঈল, তবে সে বিষ প্রাণঘাতী নয়।
বিষের প্রসঙ্গে বলতে গেলে সাপের কথা বাদ দেওয়া যায় না। সামুদ্রিক সাপেরা প্রজাতি নির্বিশেষে সবাই বিষাক্ত। পৃথিবীর সবচেয়ে বিষাক্ত সাপটির বাস অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি প্রশান্ত মহাসাগরে। এর লাতিন নাম হল 'হাইড্রোফিশ বেলচারি'। এমনিতে এরা চট করে কামড়ায় না। সরু মুখ আর পিছনে থাকা ছোট বিষদাঁতের জন্য কামড়াতে অসুবিধেও হয়। একবার এদের ছোবল খেলে কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য।
মহাসমুদ্রের অন্য দুটি ভয়ঙ্কর প্রাণী 'কিলার হোয়েল' এবং 'স্পার্ম হোয়েল'।
নামে হোয়েল হলেও কিলার হোয়েল আসলে 'দৈত্যাকার-ডলফিন' বা 'শুশুক'। কম-বেশি ন' মিটার লম্বা এই প্রাণীটির বাস অতলান্তিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তৃত অঞ্চলে। এই ডলফিনকে ভয় করে না এমন সামুদ্রিক প্রাণী হাতে গোনা যায়। মাছ, সিল, পেঙ্গুইন থেকে আরম্ভ করে বিশ্বের বৃহত্তম প্রাণী নীল তিমি পর্যন্ত সবাই এর শিকার। কিন্তু দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া কিলার হোয়েল মানুষকে আক্রমণ করেছে বলে শোনা যায়নি।
এরকম একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা শুনিয়েছেন ইংরেজ ফোটোগ্রাফার হারবার্ট পন্টিং। কেন যে কিলার হোয়েল পন্টিংসাহেবের ওপর চড়াও হয়েছিল, সেটা ঠিক বোঝা যায়নি। হারপুনের চোট খেয়েও কিলার তেড়ে আসেনি, এমন নজির অনেক আছে। সত্যি বলতে কি, এরা দিব্যি পোষ মানে আর মজাদার খেলাও দেখায়।
কিন্তু স্পার্ম তিমিরই মানুষ খাওয়ার বদনাম আছে। সব জাতের তিমির মধ্যে এদের গ্রাসনালী বেশি চওড়া, একটা মানুষ তার মধ্য দিয়ে অনায়াসে যেতে পারে। অন্তত্পক্ষে তিন-চারটি মানুষ (তিমি-শিকারি) স্পার্ম তিমির পেটে প্রাণ হারিয়েছে এমন খবর আছে 'গিনেস বুক অব রেকর্ডস' বইয়ে।

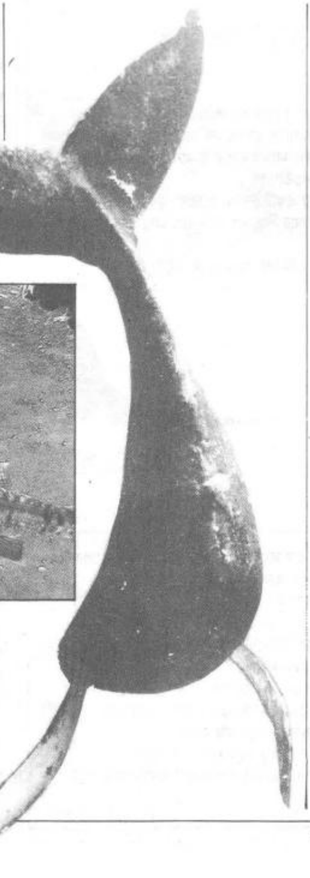

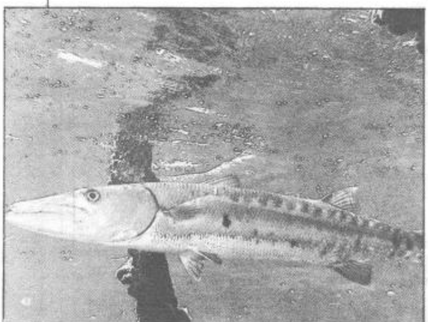

ব্যারাকুডা মাছকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাসিন্দারা হাঙরের চেয়েও বেশি ভয় পায়। তিন প্রজাতির ব্যারাকুডা আছে। ভয়ঙ্কর 'গ্রেট ব্যারাকুডা' থাকে প্রশান্ত মহাসাগরে। তাকেই বলা হয় মহাসমুদ্রের আতঙ্ক। আর, বিশাল বিশাল তিমি ও তাদের বিচিত্র জলজীবন মহাসমুদ্রকে করে তুলেছে রহস্যময়

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ধারাবাহিক উপন্যাস

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে-আগে সাদা ঘোড়ার পিঠে চলল কুমার তীক্ষ্ণ, তার পেছনে ছোট্ট একটি দল। সেই দলে রয়েছে কয়েকজন শিবির বাহক, দাস-দাসী, রান্নার ঠাকুর এবং কারারক্ষী মল্লপাল। ছন্তী এই মল্লপালকে বলে দিয়েছেন যে, কুমার তীক্ষ্ণ কোনও রাজ্যে গিয়েই রাজাদের আতিথ্য গ্রহণ করবে না। মাঠের মধ্যে শিবির খাটিয়ে থাকবে, নিজের লোকেরা রান্না করে দেবে। এবং মল্লপাল যেন কোনও সময়েই কুমারকে চোখের আড়াল না করে।

মাঠের মধ্যে ধুলো উড়িয়ে চলল ক্ষুদ্র দলটি। আকাশে ঝকঝক করছে শীতকালের রোদ। ফসল কাটা হয়ে গেছে, দু' দিকের প্রান্তর একেবারে ফাঁকা। সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে বনের রেখা, তার মাঝখান দিয়ে মাথা তুলেছে একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপাশে ছত্রপুর রাজ্য।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ স্বভাব-গম্ভীর। সহজে তার মুখে হাসি ফোটে না। পারতপক্ষে কারও সঙ্গে কথা বলে না। তার ঘোড়া অন্যদের চেয়ে অনেক আগে-আগে ছোটে। তার অঙ্গে গোলাপি রঙের মখমলের পোশাক, তার মাথায় সাদা পালক বসানো পাগড়ি। তার চক্ষু দুটি পদ্মরাগ মণির মতন, তার ভুরু দুটি উড়ন্ত পাখির ডানার মতন।

আজ রাজকুমার তীক্ষ্ণর মুখমণ্ডল চাপা আনন্দে উজ্জ্বল। তার জীবনে এই প্রথম সে স্বাধীনভাবে পথে বেরিয়েছে। রাজপ্রাসাদ ও উদ্যানের মধ্যেই তাকে কাটাতে হয়েছে বছরের পর বছর। ছন্তী তাকে বন্দী করে রাখেননি, কিন্তু সব সময় চোখে-চোখে রেখেছেন। তিন-চারজন শিক্ষক ও গুরু ছাড়া আর কারও সঙ্গে তাকে মিলতেই দেওয়া হয়নি। রাজকুমার তীক্ষ্ণ শাস্ত্র পড়েছে, অস্ত্রশিক্ষা করেছে কিন্তু আর কোনও বিষয়ে সে কিছুই জানে না।

ক্রমে এই দলটি প্রান্তর পেরিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করল।

এখানে গাছপালাগুলি এমন বিশাল ও পত্রবহুল যে, দিনের আলোতেও ছায়া-ছায়া হয়ে আছে। মাঝে-মাঝে শুকনো পাতায় কোনও জন্তু-জানোয়ার ছুটে যাওয়ার খসখস শব্দ হয়। এক সময় দূরে একটা কোনও প্রাণীর করুণ ডাক শুনে কুমার তীক্ষ্ণ ছুটে গেল সেই শব্দ অনুসরণ করে। একটা জলাশয়ের ধারে এসে সে দেখল একটা অদ্ভুত দৃশ্য। এক বিশাল অজগর সাপ গিলে ফেলতে চাইছে

একটা হরিণকে। হরিণের শরীরের অর্ধেকটা ঢুকে গেছে সেই অজগরের মুখে, কিন্তু হরিণটার বড়-বড় শিং সেই অজগরটা গিলতে পারবে না। হরিণটা তখনও মরেনি। সে আর্তনাদ করে চলেছে।

মল্লপাল বিড়বিড় করে বলল, "দেখুন, কুমার। যে যতটা গিলতে পারে না, তার চেয়েও বেশি গ্রাস করতে চায়। একেই বলে লোভ।"

কুমার তীক্ষ্ণ, সেই বিশাল অজগরকে মারবার জন্য ধনুকে তীর জুড়ল।

তখন তার সঙ্গের লোকজনেরা চিৎকার করে বলে উঠল, "মারবেন না, কুমার মারবেন না। অজগর সাপ মারা যায় না।"

কুমার তীক্ষ্ণ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন, অজগর মারা যাবে না কেন?"

একজন বলল, "অজগরের চামড়ায় তীর বেঁধে না। এই সাপ কত বড় হয় তার ঠিক নেই। ওর মুখ দেখা যাচ্ছে কিন্তু লেজটা পুরো দেখা যাচ্ছে না। ওকে বিরক্ত করলে সারা বন তোলপাড় করে দেবে। লেজের ঝাপটে আমাদেরও শেষ করে দেবে।"

কুমার তীক্ষ্ণ বলল, "তা হলে তোমরা সবাই দূরে সরে যাও। ওই অতি লোভী সাপটাকে হত্যা না করে আমি এখান থেকে যাব না।"

মল্লপালও নিরস্ত করার চেষ্টা করল কুমারকে। কিন্তু কুমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে তীর-ধনুক তুলে রইল, অন্যরা ভয়ে সরে গেল অনেকখানি দূরে। শুধু জয়পাল বাধ্য হয়ে রয়ে গেল। ছন্তী আদেশ করেছেন, তাকে সব সময় কুমারের কাছাকাছি থাকতে হবে।

কুমার তীক্ষ্ণ একসঙ্গে দশটি বাণ মারল সেই অজগরের মাথার কাছে। কয়েকটি বাণ সত্যিই পিছনে পড়ে গেল, কয়েকটি বাণ বিঁধল। অজগরটার পেটের কাছটা ফুলে উঠল হঠাৎ। কুমার আরও দশটি বাণ মারতেই অজগর তার মুখ থেকে ফেলে দিল হরিণটা। তারপর সে মাথা ফেরাল এদিকে, তার চোখ দুটি আগুনের ভাটার মতন জ্বলছে।

তারপর মনে হল যেন জঙ্গলের মধ্যে ঝড় উঠেছে। সামনের দিকে অজগরের মুখ, আর পেছনের দিক থেকে অজগরের লেজটা লকলক করে ধেয়ে আসছে অনেক গাছপালা ভেঙে। সেই লেজের অংশটাকেই মনে হয় সাতখানা সাপের মতন। অজগরের নিশ্বাসের ঝাপটায় দাঁড়িয়ে থাকাই শক্ত।

মল্লপাল আর্ত চিৎকার করে বলল, "কুমার, জলে ঝাঁপ দিন, নইলে বাঁচতে পারবেন না।"

কিন্তু রাজকুমার তীক্ষ্ণ ততক্ষণে তীর-ধনুক ছেড়ে তলোয়ার হাতে নিয়েছে।

একগলা জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে মল্লপাল সবিস্ময়ে দেখল, কুমার তীক্ষ্ণ তলোয়ার নিয়ে শূন্যে লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে, মুহূর্তে এক দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে, যেন সে-ও একসঙ্গে সাতজন মানুষ।

তারপর সেই অজগরের টুকরো-টুকরো শরীর ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে।

সেই অজগরকে সম্পূর্ণ বিনাশ করার পর একটা গাছের ডাল ধরে নেমে এল কুমার তীক্ষ্ণ। তারপর সে সরোবরে নেমে চোখে-মুখে জলের ছিটে দিল।

মল্লপাল আগে কখনও কুমার তীক্ষ্ণকে লড়াই করতে দেখেনি। এবার সে হাত জোড় করে বলল, "ধন্য, আপনি কুমার। আপনার মতন এমন অল্প বয়েসীর এমন বিক্রম যে সম্ভব, তা চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করা যায় না।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ লাজুকভাবে বলল, "আমি কখনও কোনও

জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করিনি। অজগরটা ওই হরিণটিকে জ্যান্ত গিলছিল দেখে আমার রাগ হল।"

মল্লপাল বলল, "এবার বুঝলাম, ছন্তী আপনার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন কেন? আপনি দিগ্বিজয়ী হবেন অবশ্যই।"

এর পর বন পেরিয়ে, পাহাড়ের গা দিয়ে এই দলটি এল ছত্রপুর রাজ্যের প্রান্তে। সেখানেই রাত্তিরের মতন শিবির ফেলা হল। লুকা নামে একজন অনুচরকে পাঠানো হল ওই রাজ্যের খবর আনার জন্য।

সে রাত্রি নির্বিঘ্নে কেটে গেল।

পরদিন দুপুরে লুকা অনেক খবর নিয়ে এল।

এ রাজ্যের রাজা বেশ বৃদ্ধ এবং দুর্বল। দু'জন রাজকুমারও খুব বিলাসী, যুদ্ধবিদ্যা বিশেষ জানে না। রাজ্যটি প্রকৃতপক্ষে শাসন করে রাজার শ্যালক জয়রাম। সে যেমন শক্তিশালী, তেমন অহঙ্কারী। রাজধানীর চৌরাস্তায় সে একটি সোনার কলস রেখে দিয়েছে। আর ঘোষণা করেছে যে দেশ-বিদেশের কোনও যোদ্ধা যদি তাকে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় হারাতে পারে, তা হলে ওই সোনার কলসটি তাকে দেওয়া হবে।

লুকা হাত দিয়ে দেখাল, সেই কলসটি এই অ্যাত্ত বড়! এরকম সোনার কলস যে পাবে তার সাত পুরুষকে আর চিন্তা করতে হবে না। তবে, এর মধ্যে অন্তত চোদ্দজন যোদ্ধা ওই সোনার কলসের লোভে জয়রামের সঙ্গে লড়াই করতে এসে প্রাণ দিয়েছে।

অন্য একজন বলল, "আমাদের রাজকুমার অজগর হত্যা করেছেন। তিনি মহাবীর। তা হলে এবার ওই সোনার কলস আমাদের রাজ্যে যাচ্ছে।"

লুকা একটু থমকে গিয়ে বলল, "সত্যি কথা বলব? আমি জয়রামকে এক ঝলক দেখেছি। তাঁকে দেখে মানুষ বলে মনে হয় না,

ঠিক যেন একটা দৈত্য। তিনি নাকি তলোয়ারের এক কোপে একটা তাল গাছ কেটে ফেলতে পারেন। আমাদের রাজকুমারের মতোই সাহস যেন, তিনি গায়ের জোরে তো পারবেন না। জয়রামের হাত দুটোও কত লম্বা-লম্বা। এ লড়াইয়ে দরকার নেই, চলুন আমরা দেশে ফিরে যাই।"

মল্লপাল বলল, "অতবড় অজগর সাপটা, সেও তো একটা দৈত্যের মতন। কত বড় তার ল্যাজটা ছিল দ্যাখোনি ?"

কুমার তীক্ষ্ণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে গম্ভীরভাবে বলল, "জয়রামের সঙ্গে কাল সকালে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামব। তোমরা খবর দিয়ে এসো।"

পরদিন যথাসময়ে রাজকুমার তীক্ষ্ণ সদলবলে এসে উপস্থিত হল চৌরাস্তায়। দামামাধ্বনি দিয়ে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে রাজপুরীর অনেকেই এসে হাজির হয়েছে লড়াই দেখতে। ফেরিওয়ালারা সেখানে মিঠাই ও মুড়ি-বাতাসা বিক্রি করছে।

জয়রাম এল খানিকটা দেরি করে। সত্যিই তাকে দেখলে ভয় করে। হেলেদুলে এমনভাবে হাঁটছে, যেন একটি চলন্ত পাহাড়। তার গলায় সোনার হার, দু' হাতে সোনার কবচ।

সোনার কলসটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সে এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, "কই, কে আমার সঙ্গে লড়বে ? তেমন যোদ্ধা তো কাউকে দেখছি না।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ এক পা এগিয়ে এসে বলল, "হে বীর, আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি আপনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাই।"

জয়রাম ঝুঁকে পড়ে কুমার তীক্ষ্ণকে দেখল। তারপর অট্টহাসি করে উঠল। হাসির দমকে দুলে-দুলে উঠতে লাগল তার শরীর।

একটু পরে হাসি থামিয়ে বলল, "তুই কে রে ? এইটুকু পুঁচকে ছেলে লড়বে আমার সঙ্গে। তোর সাহস তো কম নয়। মরবার সাধ হয়েছে বুঝি। যা, যা, পালা, পালা।"

মল্লপাল তখন এগিয়ে এসে বলল, "হে মহাশয়, ইনি অভিছত্রপুরের যুবরাজ তীক্ষ্ণ। এঁর তুল্য বীর কোনও দেশে নেই। ইনি আপনার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে চান।"

জয়রাম এবার ধমকের সুরে বলল, "অভিছত্রপুরের যুবরাজ তো কী হয়েছে। আমি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি না। আমার সামনে একবার কেউ তলোয়ার তুললে আর প্রাণ নিয়ে ফেরে না। ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

মল্লপাল বলল, "তা হলে তো সোনার কলসটাও আমাদের নিয়ে যেতে হয়। আপনি হার স্বীকার করছেন নিশ্চয়ই।"

জয়রাম ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে বলল, "তবে রে। এত বড় কথা !"

জয়রাম তলোয়ার তুলে এক কোপে রাজকুমার তীক্ষ্ণকে শেষ করে দিতে গেল।

কিন্তু রাজকুমার তীক্ষ্ণ যেন অদৃশ্য হয়ে যেতে জানে। চোখের নিমেষে সে ঘুরে গেল অন্য দিকে। লাফিয়ে উঠতে লাগল শূন্যে। এক-একবার তাকে দেখা যায়, এক-একবার যেন সে কোথায় হারিয়ে যায়। শুধু শোনা যায় অস্ত্রের ঝনঝন শব্দ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, জয়রাম ধপাস করে চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে, আর ঠিক গলার কাছে তলোয়ারের ডগা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজকুমার তীক্ষ্ণ।

সমবেত জনতা বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে রইল কয়েক পলক। তারপর সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ল। অত্যাচারী জয়রামকে এ-রাজ্যের মানুষ বিশেষ পছন্দ করে না, সে পরাজিত হওয়ায় সবাই খুশি হয়েছে।

তলোয়ারের অগ্রভাগ জয়রামের গলায় ঠেকিয়ে রেখে রাজকুমার তীক্ষ্ণ জিজ্ঞেস করল, "কী, লড়াইয়ের শখ মিটেছে ? আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে ?"

জয়রাম কোনও উত্তর দিল না।

জনতার মধ্য থেকে কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল, "কুমার ওকে মেরে ফেলুন। ওর গলা কেটে ফেলুন। আগে যাদের হারিয়েছে, তাদের সকলকেই জয়রাম হত্যা করেছে।"

রাজকুমার তীক্ষ্ণ বলল, "না, আমি মানুষ মারতে আসিনি। আমি শুধু এর বীরত্বের গর্ব ভাঙতে এসেছিলাম। সকলের সামনে আমি প্রমাণ করেছি, জয়রাম সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা নয়।"

মল্লপালও চোখের ইশারায় জানাল জয়রামের গলাটা কেটে ফেলার জন্য।

কুমার তীক্ষ্ণ তবু বলল, "না, ওকে মারব না। দ্যাখো, ও সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে, ওর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। এবার কেউ ওর মুখে-চোখে জল ঢেলে দাও।"

জয়রাম নিস্পন্দ হয়ে চোখ বুজে আছে দেখে কুমার তীক্ষ্ণ তলোয়ারটা সরিয়ে এনে খাপে ভরল।

সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জয়রাম। কুমারকে আর অস্ত্র তোলার সুযোগ না দিয়েই তার ঘাড়ের ওপর মারল এক কোপ।

রাজকুমার তীক্ষ্ণ মাটিতে ঢলে পড়ে গেল।

জয়রাম আবার হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "স্পর্ধিত বালক, এই তোর শেষ। শুধু তলোয়ার চালাতে শিখে আমার সঙ্গে লড়তে এসেছিলি ? শত্রুর যে শেষ রাখে, সে কখনও যোদ্ধা হতে পারে ? তুই শত্রুকে না মারলে, শত্রু তোর সর্বনাশ করবে, এই তো নিয়ম।"

তলোয়ারের রক্ত মুছতে-মুছতে জয়রাম সগর্বে বলল, "ওরে, কে আছিস, এই মৃতদেহটাকে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আয়।" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

কল্পবিজ্ঞানের গল্প

কেকাবাবুর ভয়

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

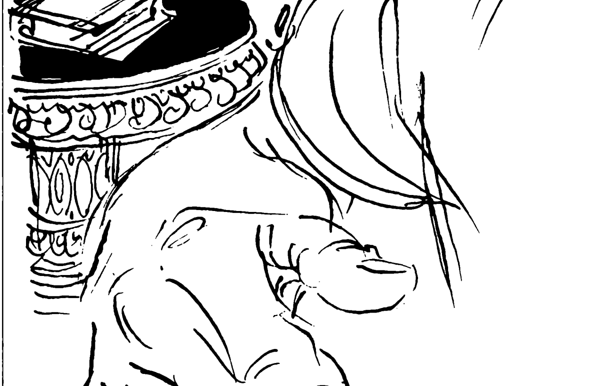

রবিবারের কাগজে বিজ্ঞাপনগুলো খুঁটিয়ে পড়া আমার অভ্যেস। এখন চাকরি করি কলপক্কমে—মহাবলীপুরমের খুব কাছে—রিঅ্যাক্টর রিসার্চ সেন্টারে। রোজ সকালে কফির সঙ্গে ওখানকার ছেলে-বুড়ো যে কাগজ পড়ে—সেটাই পড়তে বাধ্য হই। কিন্তু ছাপা যতই সুন্দর হোক পড়ে তেমন আরাম পাই না। তাই কলকাতায় যখনই ফিরি রবিবারের ইংরেজি-বাংলা মিলিয়ে তিনখানা কাগজ নিয়ে না বসা পর্যন্ত মনে হয় ছুটিটা পুরো হল না।

প্রথমে বাংলা, তারপর ইংরেজি। বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপনের পাতায় এসে থমকে গেলাম। এও কি সম্ভব, আজকের দিনে? কে একজন বাঘের চামড়া বিক্রি করছেন—স্টাফ্ড মাথা সুদ্ধু। ঠিকানা দেওয়া আছে, ফোন নম্বর নেই। তার মানে যারা

সত্যি-সত্যিই কিনতে আগ্রহী তারাই যেন যায়, খামোখা টেলিফোন করে বিরক্ত না করে। হয়তো এমনও হতে পারে, ভদ্রলোকের বাড়িতে ফোন নেই। হয়তো অবস্থা এককালে ভাল ছিল, এখন পড়তির দিকে। তাই দায়ে পড়ে পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি করে দিচ্ছেন।

কিন্তু তাই বলে বাঘের চামড়া বিক্রি! বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে যেসব আইনকানুন আছে বিজ্ঞাপনদাতা কি তার কোনও খোঁজই রাখেন না! না কি সব জেনেশুনেও এই প্রচেষ্টা। খুবই দুঃসাহস বলতে হবে। ইনি কি এর দ্বারা ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ-এর কলকাতা শাখার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন? চামড়া বিক্রি করতে চাওয়া থেকে অবশ্য কিছুই প্রমাণ হয় না। এটা তাঁর পিতামহের বন্দুকে মারা উনিশশো বিশ সালের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও হতে পারে। তখন বাঘ শিকার তো বেআইনি ছিলই না বরং ছিল উচ্চশ্রেণীর খেলা। রাজামহারাজা সাহেবসুবোরা সকালের জলখাবারের আগে গোটা দুই বাঘ কিংবা গণ্ডার মেরে হাত ধুয়ে খেতে বসতেন। এমনকী সিংহের মামা ভোম্বলদাস, বাঘ মেরেছেন গোটা পঞ্চাশ—ছেলে ভুলনো ছড়ায় এমন কথাও শোনা যেত। শুনে কেউ দৌড়ে পুলিশ ডাকতে ছুটত না। কিন্তু সে তো সেকালের কথা।

এখন উনিশশো নব্বই সালে কে ঢাকঢোল পিটিয়ে বাঘের চামড়া বিক্রি করছে জানতে কৌতূহল হল। কে এটি বিক্রি করছেন আর কারাই বা কিনতে আসছেন? মৃত বাঘটির চামড়া থেকে হয়তো কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যাবে—এই রকম সাত-পাঁচ ভেবে রওনা হলাম।

অকুস্থলে পৌঁছে দেখি বেশ লোকজনের জটলা। একটি ভাঙা-মতো হিলম্যান থেকে অগুনতি লোক নামতে দেখলাম—সকলের মাথায় কাপড়ের টুপি, কাঁধে ক্যামেরা, হাতে বাইনোকুলার, জুতোয় কাদা আর ঘাসের কুচি। ইউনিফর্ম দেখে ভুল হওয়ার উপায় নেই—এঁরা হলেন আমাদের 'প্রকৃতি সংসদের' সদস্য। আমি এক সময়ে এঁদের সঙ্গে ভোররাতে উঠে বনেবাদাড়ে পাখি পর্যবেক্ষণ করে বেড়িয়েছি। জংলা, পোড়ো, জলাজায়গা অর্থাৎ পাখিদের বিচরণক্ষেত্র রক্ষা করার জন্য কবে থেকে এই সংসদের সদস্যরা জান লড়িয়ে খেটে যাচ্ছেন। এঁদের জন্যই নরেন্দ্রপুরের বিস্তর জঙ্গল সিনেমাওয়ালাদের উৎপাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই কংক্রিটের শহরের আশেপাশে আজও যে কিছু পাখপাখালি নির্ভয়ে চরে বেড়াতে পারছে তার অনেকটাই এঁদের চেষ্টায়।

সকলেই দেখছি খুব উত্তেজিত গলায় কথাবার্তা বলছেন। দু-একটা কথা কানে এল,

"চাঁদা দেব না বলেছি মশাই, তাতেই..."

"ওহ, কী দিনকাল..."

"একবার আস্পর্ধাটা দেখুন!"

"কাদের কীর্তি, কিছু অনুমান..."

সকলে মিলে একসঙ্গে কথা বলছেন, দু-একবার ক্ষীণভাবে প্রশ্ন করার চেষ্টা করে দেখলাম লাভ নেই। অগত্যা ওঁদের কথাবার্তা কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম। যা মনে হল, বিজ্ঞাপনটা পাড়ার কিছু দুষ্টু ছেলের কীর্তি। কোনও কারণে তারা বিষম খেপে গিয়েছিল

ভদ্রলোকের উপর। হয়তো সেটা চাঁদা না দেওয়ার জন্যও হতে পারে। অন্তত বাড়ির মালিকের বক্তব্য সেটাই।

আমাকে দেখতে পেয়ে প্রকৃতি সংসদের সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য বিজয়দা হইহই করে এগিয়ে এলেন। ভাবলাম, উনি হয়তো বাঘের চামড়া বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে পারবেন। কিন্তু কোথায় বাঘ, কোথায় কী! বিজয়দার মানসিক গঠন অনেকটা লক্ষ্যভেদ করার আগে অর্জুনের মতো।

"এই যে কুশল, এত তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চক্কর মারিস, কোথাও শহরের মধ্যে হুপোর দেখা পেয়েছিস?"

বিজয়দার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানে বোম্বাই আর মাদ্রাজ। চক্কর কাটা বলতে কী বোঝায়, আমি জানি না। মাসের মধ্যে পনেরো দিন বোম্বাই যাওয়াকে যদি উনি চক্কর কাটা বলেন, তা হলে আর কী করা যাবে। তবে ওঁর উৎসাহ দেখে বুঝলাম এটা আসলে কোনও প্রশ্ন নয়। উনি শহরের মধ্যে হুপো দেখেছেন।

বললাম, "সেই একবার ভরতপুরে দেখা পেয়েছিলাম। আপনি কোথায় দেখলেন?"

আমার পিঠে প্রচণ্ড এক চড় কষালেন বিজয়দা। "কেন, তোদের ওই যোধপুর পার্কে।"

"সত্যি?"

"তবে আর বলছি কী। পরশু বিকেলের দিকে দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনে দিয়ে হাঁটছি—দেখি একটা পোড়ো জমিতে ঠুকরে বেড়াচ্ছে। এখনও দু-চারটে পোড়ো জমি আছে তাই রক্ষে। প্রথমে মনে করলাম কাঠঠোকরা বুঝি। তারপর ভাবি, নাঃ। কাঠঠোকরা তো মাটিতে খাবার খোঁজে না। তবে হ্যাঁ, চেহারাটা অনেকটা ওই জাতেরই। আর-একটু নজর করে দেখি তো। আরে, এ তো হুপো না হয়েই যায় না। সেই ডানা, সাদা-কালো ডোরা ঝলমল করছে—এ তো ভুল হওয়ার নয়!"

বাঘের চামড়ার নাটক বেমালুম ভুলে গিয়ে ওইখানে দাঁড়িয়েই গল্প শুরু হয়ে গেল। রোদ ক্রমশ বাড়তে থাকল। বিজয়দা মাঝে-মাঝেই টুপি দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। কে কবে কোথায়-কোথায় হুপো দেখেছে সেই নিয়ে চলতে লাগল আলোচনা। আনন্দরূপ বলল, রাজস্থানে একবার সে একটা হুপো দেখেছিল—তার ছবিও আছে, তবে একটু আউট অব ফোকাস।

বাঘের চামড়ার নাটক কতদূর গড়াল সেকথা ভুলে গিয়ে আমরা এগোতে লাগলাম। গাড়িটা ছিল মিত্তিরদার। ওঁর অন্য কোথায় যাওয়ার ছিল, তাই চলে গেলেন। সেবারে কয়েলের বাগানে কীভাবে দামার গান রেকর্ড করা হয়েছিল তার রোমহর্ষক বিবরণ শুনতে-শুনতে আমরা বাসস্টপে পৌঁছলাম।

বিজয়দা বললেন, "কতদিন আছিস? সময় পেলে একদিন চলে আয়। অনেক পাখির ডাক রেকর্ড করেছি। তা ছাড়া আমার এক কাকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আমেরিকায় ছিলেন অনেকদিন।"

"আমেরিকায়? ওর মধ্যে আমি নেই।"

"কেন, ভয় পাচ্ছিস কেন?"

"না বাবা। এদেশে এই নেই, ওই নেই। এসব শুনতে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই। পরেরবার এলে পাখির ডাকের রেকর্ড শুনে আসব। ততদিনে আপনার কাকা নিজের দেশে ফিরে যাবেন আশা করি।"

"আরে দূর। উনি ওরকম না।"

"কীরকম তবে? আমেরিকা থেকে যারা আসে তাদের সাত হাত দূর থেকে চেনা যায়।"

"তুই আয় তো। তারপর বুঝবি। ইনি দারুণ মজার লোক।"

এই বলে চলে গেলেন বিজয়দা। আমি মনে-মনে ভাবলাম, বিজয়দা নিজেও কিছু কম মজার লোক নন। মুখে যাই বলি, ওঁর বাড়ি একদিন যাব নিশ্চয়ই।

অল্পই বাকি ছিল ছুটির। একদিন গড়িয়াহাটের দিকে এক পিসির বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছি, ভাবলাম কাছেই তো বিজয়দার বাড়ি। একটু দেখা করেই যাই। সেই ইন্টারেস্টিং কাকাবাবুটির সঙ্গেও মোলাকাত হবে।

বিজয়দা ইলেকট্রিসিটির তোয়াক্কা করেন না। তাই তাঁর বাড়ির দরজায় কলিং বেলের বদলে একটা মোটা দড়ি ঝোলে। সেটায় টান মারতেই ভেতরে ঘণ্টা বেজে উঠল ঢং করে।

যিনি দরজা খুললেন, তাঁকে দেখে বয়স বোঝার উপায় নেই। চুল ধবধবে সাদা, তাতে সামান্য তামাটে ছোপ। গায়ের রঙে গোলাপি আভা। মোটা সাদা গোঁফ। দাড়ি থাকলে বেশ মানানসই হত কিন্তু দাড়ি নেই। খাড়া প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি, পরে আছেন পাজামা-পাঞ্জাবি, তবে আশ্চর্যের বিষয় এই, গরমে তাঁর কনুই অবধি লম্বা দস্তানা, ক্রিকেট প্যাডের মতো পুরু।

আন্দাজ করলাম, ইনিই সেই আমেরিকান কাকা। পরিচয় দিলাম। কাকাবাবু আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে একটু পিছিয়ে গেলেন।

"ও বুঝেছি। তুমি কুশল মজুমদার। রিঅ্যাকটর রিসার্চ সেন্টার। বিজয় বলছিল তুমি একদিন আসবে।"

আমি হাসি-হাসি মুখে এগোতে গেলাম। প্রণাম করলে উনি চটে যাবেন কি না কে জানে। কাকাবাবু সম্ভবত আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই মাথা নেড়ে বাধা দিলেন। বললেন, "চটিটা ওইখানে খোলো। বাঁ দিকে বাথরুম। হাত-পা ধুয়ে এসো।"

এ আবার কী রে বাবা। আমি তো হতভম্ব। পাছে তিনি কিছু মনে করেন তাই বাথরুমে গিয়ে একটু খুটখাট করে আবার ফিরে এলাম।

কাকাবাবুকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকলাম। আমাকে বসবার জন্য একটা মোড়া দেখিয়ে দিয়ে উনি নিজে একটা পিঠ-খাড়া চেয়ারে বসলেন, আমার সঙ্গে বেশ একটা

দূরত্ব রেখে। ওঁর চোখ কিন্তু আমার দিকে সেঁটেই আছে, যেন উনি চোখ ফেরালেই আমি কিছু একটা কাণ্ড করে ফেলব। আমিও ওঁর দিকে অপলক তাকিয়ে আছি, দেখছি এবারে উনি কী করেন।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে হাত বাড়ালেন। লক্ষ করলাম, পাশের ছোট টেবিলে কী সব জিনিসপত্র। তার মধ্যে থেকে উনি তুললেন কাচের সরুমতো সিলিণ্ডার। সেটাকে নাকের কাছে ধরে লম্বা নিশ্বাস নিলেন। তারপর সেটা আবার সযত্নে যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দিলেন। দেখা যাচ্ছে উনি যা করেন সবই খুব সন্তর্পণে, যেন একটু অসাবধান হলেই সব ভেঙেচুরে যাবে।

কাচের সিলিণ্ডারের দিকে আমি তাকিয়ে আছি দেখে কাকাবাবু জানালেন, "ওটি কিনেছি জাপানে। ওরা মাঝে-মাঝেই বিশুদ্ধ

অক্সিজেন লাংসে ভর্তি করে নেয়। পরিবেশ তো দূষিত হতে-হতে একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে।"

"যা বলেছেন।" আমি সায় দিয়ে বললাম, "পাঁচ বছর সমুদ্রের ধারে আছি। এখন কলকাতায় এলে আমারই নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।"

"হয় তো? হয় কি না বলো।"

উল্লসিত হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। পরক্ষণেই মিইয়ে গিয়ে বললেন, "হোক সমুদ্র। কাজ তো করছ রিঅ্যাক্টরে। হাইলি ডেঞ্জারাস।"

এসব অপপ্রচার শুনে-শুনে আমার কান পচে গেছে। হাইলি ডেঞ্জারাস না আরও কিছু। অনেকদিন ধরেই চেষ্টা চলছে পাবলিকের মগজ ধোলাই করার। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর মানেই নাকি সর্বনাশ। ইনি একে

বিজয়দার কাকাবাবু, তায় বয়সে অনেক বড়। এঁর সঙ্গে তর্ক করা উচিত হবে না। তবু হক কথাটা জানিয়ে দেওয়া দরকার।

বললাম, "দেখুন, আমি যেখানে কাজ করি তাকে বলে ব্রিডার রিঅ্যাক্টর। এখানে একটা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখান থেকে আকাশে-বাতাসে দূষিত তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ার কোনও আশঙ্কাই নেই। আবর্জনা সংগ্রহ করে তাকে হয় মাটির নীচে পুঁতে ফেলার কিংবা গভীর সমুদ্রে ফেলে আসার বিরাট ও জটিল ব্যবস্থা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঝনঝন।"

"আজ্ঞে?" আমি একটু অবাক হয়ে বক্তৃতা থামিয়ে ওঁর দিকে তাকালাম।

কাকাবাবু কোনও কথা বললেন না। আমি বললাম, "আপনি কিছু বলছিলেন?"

"উঁহু।" বলে কাকাবাবু আবার আমাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

এ-আবার কী পাগলের পাল্লায় পড়া গেল বাবা। বিজয়দাই বা গেলেন কোথায়? যা হোক কিছু কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমি মরিয়া হয়ে বলে উঠলাম, "আপনি তো অনেকদিন বাদে দেশে ফিরলেন—তাই না?"

কাকাবাবু বললেন, "ফিরেছিলাম। সে বহুকাল আগে। উনিশশো বাহান্ন। দেশে ফিরলাম। ফিরে আর পালাতে পথ পাই না।"

"কেন, কী হয়েছিল?"

"কী হয়েছিল? কী হয়নি তাই বলো? ওহ, সে কী ব্যাপার। তুমি তার কী জানবে ইয়ং ম্যান। আজই না হয় রিঅ্যাক্টর সেন্টারে কাজ করছ। কেউ জানত তখন রিঅ্যাক্টর কাকে বলে? কেউ নাম শুনেছিল নিউক্লিয়ার এনার্জির? সেই উনিশশো বাহান্ন সালে? সবে তখন বিকিনি অ্যাটলে হাইড্রোজেন বোমা ফেটেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে হইচই। এমন সময় জাপান থেকে আসা প্লেনের ডানায় পাওয়া গেল সেই মারাত্মক বস্তু।"

নাটকীয় ভাবে থেমে গেলেন কাকাবাবু। অপেক্ষা করলেন আমি কখন প্রশ্নটা করব।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী পাওয়া গেল?"

"কী আবার? তেজস্ক্রিয়তা—রেডিও অ্যাকটিভিটির চিহ্ন।"

"আপনি বললেন প্লেনের ডানায় পাওয়া গেল?"

"হ্যাঁ, তাই তো।"

"কী করে পাওয়া গেল?"

"কী করে? শুনতে চাও কী করে?"

এবারে আমি অপেক্ষা করে রইলাম। কাকাবাবু বলে চললেন, "এই তোমাদের এখানকার কিছু ছোকরা বিজ্ঞানী ডানার তেল চেঁছে পরীক্ষা করছিলেন। পেপার হবে। মানুষের প্রাণ নিয়ে পিএইচ· ডি· থিসিস। হুঁঃ।

"ঘটনাটা শুনেছিলাম। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে পরীক্ষামূলকভাবে পর পর কয়েকটি পরমাণু বোমা ফাটানো হয়। এই বোমার তেজস্ক্রিয় ভস্ম বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটিতে নেমে এসেছিল।"

কাকাবাবু নিজের মনে বলেই চলেছেন, "তা করছিস বেশ করছিস। তাই বলে বাড়ির ছাদে হাঁড়ি বসিয়ে বৃষ্টির জল মাপা। এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে?"

"বৃষ্টির জল মাপা?" আমি অবাক হওয়ার ভান করলাম। উহ, বিজয়দা আসছেন না কেন?

"বলি বৃষ্টিটা আসছে কোথা থেকে বোঝোনি? পুরো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আকাশ তো হাইড্রোজেন বোমার বিষে থিকথিক করছে। সেখান থেকে যে মেঘ আসছে, তাতে বিষ থাকবে না তো কি দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুতে থাকবে?"

"সে তো ঠিক। তারপর?"

"তারপর আর কী। তারপর যা হওয়ার তাই হল। মেঘ থেকে বৃষ্টি। আর সে বৃষ্টি কি শুধু ওই ছোকরা বিজ্ঞানীর ছাদে হাঁড়ি ভর্তি করার জন্য পড়ল? পড়ল মাঠে-ঘাটে, বনে-প্রান্তরে, রেললাইনে, পুকুরে, নদীতে সর্বত্র। জলের ফোঁটার সঙ্গে মাটিতে ঢুকে গেল বিষ। তেজস্ক্রিয় বিষ। সেই তেজস্ক্রিয় ঘাস খেয়ে গোরুর দুধ হল বিষাক্ত—গাছের আম..."

এমন সময় আমাকে যেন বাঁচাবার জন্যই সময় বুঝে ঘণ্টা বাজল। বিজয়দা। উনি আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, "আরে তুই কতক্ষণ? ও, কাকাবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে দেখছি।"

কাকাবাবু ততক্ষণ নিজের মনে বলেই চলেছেন, "পুকুরের জল, মাঠের ঘাস, গাছের আম বিষে-বিষে জর্জরিত।"

সেদিকে এক নজর তাকিয়ে বিজয়দা বললেন, "ও, পৌঁছে গেছেন ফেভারিট টপিক-এ। রেডিও অ্যাকটিভ আম।"

আমি অত জানতাম না। ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসে নিরীহের মতো জিজ্ঞেস করলাম, "লোকেরা সেই আম খেয়েছিল?"

"হ্যাঁ, খেয়েছিল। খবরটা চালু হওয়ার

আগেই আমের সিজন শেষ। সর্বনাশ ততক্ষণে ঘটে গেছে। আমিও খেয়েছিলাম প্রচুর। বিদেশে ফিরে যাব বলে শুধু আমই খেতাম।"

"খেয়ে কিছু হল ?"

"তখন বুঝিনি। বুঝিনি সেই তেজস্ক্রিয় স্ট্রনশিয়ম নব্বই হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায় সেঁধিয়ে গেছে। তা নইলে কি আজ আর এই দুর্গতি..."

কাকাবাবু আবার অক্সিজেন শোঁকার জন্য হাত বাড়ালেন। আমি দেখলাম, ওটা ওঁর নাগালের বাইরে। তাই উঠে গিয়ে সিলিণ্ডারটা আনতে গেলাম। কাকাবাবু হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বিজয়দা বললেন, "তুই ছেড়ে দে।" কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। আমি কি অস্পৃশ্য নাকি যে, আমার ছোঁয়া লাগলে সব কিছু বিষাক্ত হয়ে যাবে ? তিনজনের হাতাহাতিতে টেবিলটা একটু কাত হয়ে গেল, কাকাবাবু পড়োপড়ো হচ্ছেন দেখেই আমি চট করে ওঁকে ধরে ফেললাম।

হুমড়ি খাওয়া অবস্থাতেই পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। সোজাও হন না, পড়েও যান না! ব্যাপারটা কী ? অজ্ঞান হয়ে গেলেন মনে হচ্ছে। বিজয়দার দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাতেই দেখি তিনি সোফায় গদিয়ান হয়ে নির্বিকার ভাবে পা নাচাচ্ছেন।

কাকাবাবুর চোখ মাছের মতো ভাবলেশহীন। তবু ভাবলাম হয়তো গেঁটে বাত, সোজা হতে পারছেন না। ওঁকে টেনে দাঁড় করালাম। নিচু হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ধরব, না নিজেই উঠতে পারবেন ?"

কোনও উত্তর নেই। অগত্যা নিজেই টানতে লাগলাম। অত বড় ওজনদার শরীর—এ কি আমার একার কর্ম ? চটে-মটে বিজয়দার দিকে তাকালাম। তাঁর কি উচিত নয় আমাকে এসে একটু সাহায্য করা ? তিনি কিন্তু নির্বিকার ভাবে বসে মিটিমিটি হাসছেন।

ইতিমধ্যে কাকাবাবু একটু-একটু করে সোজা হচ্ছেন। খুব ক্ষীণভাবে কাচের জিনিসপত্র ভাঙার আওয়াজ পেতে লাগলেন। কী ভাঙছে আবার। টেবিলের জিনিসপত্র তো ঠিকই আছে।

আওয়াজটা কাকাবাবুরই গলা থেকে আসছিল। ভারী আশ্চর্য। আমি ওঁকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। সমস্তক্ষণই কিন্তু পাকা ভেনট্রিলোকুইস্টের মতো ওঁর গলা থেকে ঝন-ঝন, ঝনাত-ঝনাত শব্দ হয়েই চলেছে। যেন কত জিনিস ভেঙে যাচ্ছে। অবশেষে ধাতস্থ হওয়ার পর কাকাবাবু শুধু একটা কথাই বললেন, "স্ট্রনশিয়ম নব্বই।"

বিজয়দা আমার দিকে চেয়ে চোখ মটকালেন। আমি ফিসফিস করে বললাম, "এসবের মানে কী ?"

"বুঝলি না ?" ওঁর ধারণা সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগে আম খেয়ে ওঁর হাড়ের মধ্যে স্ট্রনশিয়ম ঢুকে ওঁর হাড়গুলো কাচের মতো ঠুনকো হয়ে গেছে। মাথা খারাপ আর কাকে বলে!

আমি ঠিক হাসতে পারলাম না। ক'দিন পরে ফিরে এলাম কলপক্কমে। রিঅ্যাক্টরের সাদা গম্বুজটির দিকে তাকিয়ে মাঝে-মাঝেই মনে হয়, কাকাবাবুর অহেতুক আতঙ্কের কথা। পশ্চিমি জগতের মানুষ—হাতে দস্তানা এঁটে ঘরের মধ্যে থেকে উনি যে বিষ নেই তার থেকে নিজেকে বাঁচাচ্ছেন আর সেই জগতেরই মানুষদের নির্বিচার দায়িত্বহীনতায় আজ পরিবেশ নানাভাবে কলুষিত। বাতাসে বিষ, মাটিতে বিষ—এ পরিবেশে কতদিন দেখা যাবে কাঠঠোকরা, হুপো, বেনেবউ আর ফিঙেদের ?

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কবিতা

এসো, শুরু করি

কবিরুল ইসলাম

যে দিকে তাকাও চোখ খোলা রাখো, মনও
এই সবে শুরু ওই দূরে একজনও
উনিশে বা বিশে কোলাহলে কোলাকুলি
দোহাই তোমার, ভোলো কপচানো বুলি
তুলি হাতে তোলো, দেওয়াল-ইজেলে আঁকো
সাঁকো কি পেরোবে ? অদূরের অই বাঁকও—
আধুনিকতার প্রিয় পাঠ পেলে ভাবো
তোমার দু' দিকে ছায়াময় কেউ যাব
জীবন নামক এই যে লম্বা দৌড়
সরলরেখায় যাবে কি ভেবেছ ? ভৌর
সৌর কিরণে জানলার ফাঁকে উঁকি
ছেলেবেলা যাবে, ক্রমশ বাড়বে ঝুঁকি
এই তো জীবন এত সুন্দর, আহা,
ছোট শিশুদের হাত ধরাধরি হা হা
দিন কেটে যায়, রাত কেটে যায় ধাঁ করে
হুহু হাওয়া বয় আলোছায়াময় বাঁ করে
যেন আলপনা রুপালি সোনালি কাজ
যার তুলনায় তুচ্ছ তাজমহল
অতএব, এসো, শুরু করি কোলাহল
এই তো সময় মুঠোয় জ্যোৎস্না ধরে
এনে দিতে পারি চার-দেওয়ালের ঘরে
খুঁজে নাও মিল বাইরে ও অন্তরে
যে দিকে তাকাও চোখ খোলা রাখো, মনও
যে দিকে তাকাও কান খোলা রাখো, মনও!

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

প্রযুক্তিবিজ্ঞান

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার

যত দিন যাচ্ছে কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি ততই ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে। এইসব যন্ত্র এখন দারুণ মজার সব কাজ করে দিচ্ছে। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নিয়ে আলোচনা করেছেন
অসীমরতন ঘোষ

প্রভুভক্ত কম্পিউটার সব হুকুমই তামিল করে — *ফোটো : তপন দাশ*

কম্পিউটারের পরদার কাছে মুখ নিয়ে বললে, "এসো, একটু পড়াশোনা করি।" একটা হাসি-হাসি মুখ ফুটে উঠল পরদায়। একটা সুরেলা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "কী পড়বে ?"
"জীববিজ্ঞান।"
ফুটে উঠল জীববিজ্ঞানের নানা বিষয়ের তালিকা। তাদের একটাকে ছুঁতেই সেই বিষয়ে মজার পড়া শুরু হল।
এভাবে কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে দারুণ সুবিধে হত। এ-ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও পুরোপুরিভাবে সরাসরি কথোপকথন চালাবার আরও দেরি আছে। এই সেদিন পর্যন্ত কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান ব্যবস্থা ছিল কাগজের কার্ড ছিদ্রযুক্ত ফিতে বা পাঞ্চকার্ড। এখন এ-কাজ করা হয় চৌম্বক পদার্থের প্রলেপ লাগানো ফিতেযুক্ত ভিডিও মনিটর জোড়া কি-বোর্ডের সাহায্যে।

কম্পিউটার কীভাবে তথ্য পড়ে

কি-বোর্ড দেখতে অনেকটা টাইপরাইটারের

মতো । কম্পিউটারের কি-বোর্ডে বর্ণমালার অক্ষর, সংখ্যা, কমা, সেমিকোলন-চিহ্ন ছাড়াও আরও বেশ-কিছু চিহ্নের জন্য চাবি থাকে । কম্পিউটারের কি-বোর্ডে a লেখা চাবিটা টিপতেই একটা নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক সংকেত পৌঁছে যায় কম্পিউটারের দেহে । সেখানে বিদ্যুতের সংকেত পুনর্গঠিত হয় । কম্পিউটারের পরদায় সবসময় দপদপ করতে থাকে একটি ড্যাশ-চিহ্ন । এর নাম কারসর । এটিকে যেখানে রেখে চাবিটা টিপেছ সেখানেই ফুটে উঠবে a অক্ষরটা । কম্পিউটারের কি-বোর্ডে টাইপরাইটারের সবক'টি চাবি ছাড়াও থাকে যেখানে খুশি লেখার জন্য কারসর নড়াবার কয়েকটি চাবি । নানারকম কাজ করার জন্য থাকে বিশেষ কিছু চাবি । যেমন, মনে করো একটা কাজ বন্ধ রেখে তুমি অন্য একটা কাজ করতে চাইছ । তোমাকে ESC (Escape) নামে একটা চাবি ব্যবহার করতে হবে । সংশোধনের জন্য কোনও কিছু মুছতে গেলে DEL (Delete) চাবিটা ব্যবহার করতে হয় । কোনও নির্দেশ পুরোটা লেখা হয়ে গেছে তা জানাতে বা পরের লাইনে লিখতে চাইলে RET (Return বা Enter) চাবি টিপতে হয় । আর আছে ফাংশন-কি । অনেক চাবি টিপে যে কাজ করা যায় তা এদের একটিই করতে পারে ।

খুটখাট করে চাবি টিপে-টিপে কম্পিউটারকে তথ্য জানাবার কাজ করতে সময় লাগে । প্রায়শই কাজটা খুব বিরক্তিকর মনে হয় । এই অসুবিধে দূর করার জন্য নানারকম মজার ও মন-কাড়া ব্যবস্থা করা হচ্ছে ।

ওয়াল্ট ডিজনির কল্পনায় ভবিষ্যৎ-সমাজ হল এপকট সেন্টার । এখানে গিয়ে তোমার নিশ্চয় ইচ্ছে হবে কোথায় কী আছে তা জানতে । ভাবতে না ভাবতেই তুমি দেখতে পাবে রঙিন ভিডিও মনিটর যেন তোমার জন্যই অপেক্ষা করছে । সেখানে ফুটে আছে নানা বিষয়ের তালিকা । তোমার যেটা পছন্দ সেটা ছুঁলেই তার সম্পর্কে খুঁটিনাটি হাজার তথ্য ফুটে উঠবে পরদায় । ভিডিওর পরদা ছুঁয়ে-ছুঁয়েই জেনে ফেলতে পারবে এপকট সেন্টার সম্পর্কে নানা কথা । কীভাবে এটা সম্ভব হচ্ছে ? আসলে ভিডিও মনিটরের পরদা ফুঁড়ে লম্বালম্বি আর আড়াআড়ি সরলরেখার পথ ধরে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য সমান্তরাল অদৃশ্য অবলোহিত রশ্মি । তুমি যেই কোনও জায়গা ছুঁলে, সঙ্গে-সঙ্গে কিছু রশ্মি বাধা পাওয়ায় কম্পিউটার পেয়ে গেল আগে থেকে ঠিক করা সংকেত । সেই

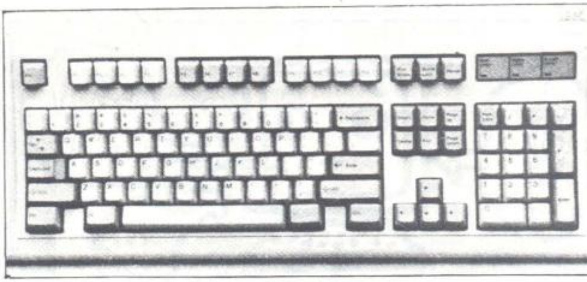

কি-বোর্ড : কম্পিউটারকে তথ্য ও নির্দেশ জানাতে হয় এর বিভিন্ন সুইচ টিপে

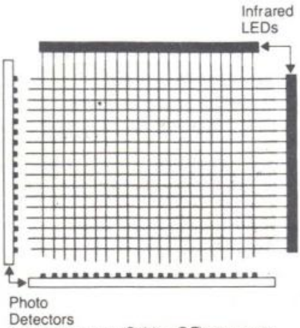

এই ধরনের পরদায় কম্পিউটার নির্দিষ্ট সঙ্কেত পায়

সংকেত পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে নির্দেশমতো অন্য তালিকা দেখাতে আরম্ভ করল । এখনকার অনেক কম্পিউটারে এই সুবিধে থাকছে । কম্পিউটারের সঙ্গে যোগাযোগ খুব আকর্ষক হয়ে উঠছে ।

আলোর কলম

যত ছোটই হোক না কেন তোমার আঙুল পরদার অনেকটা জায়গা একসঙ্গে ছোঁয় । সূক্ষ্ম কোনও কাজ তাই হাত দিয়ে করা বেশ শক্ত । বৈদ্যুতিকভাবে যুক্ত একরকম কলম পরদায় ঠেকিয়ে-ঠেকিয়ে নানারকম নকশা আঁকার কাজ হয় ।

অনুবাদক কম্পিউটার

বিজ্ঞানীরা এখন দারুণ সমস্যায় পড়েছেন । কল্পবিজ্ঞানের লেখকরা কল্পনার জাল বুনে এত দূরে চলে গেছেন যে, তার নাগাল পাওয়াই শক্ত । আরও মুশকিল হল, কল্পবিজ্ঞানের গল্প, কবিতা আর চলচ্চিত্র ইদানীং অনেকেরই ভাল লাগছে । কল্পবিজ্ঞানীরা অনেক বছর আগেই এমন অনুবাদ যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন যা এই বিশ্বের যে-কোনও ভাষা থেকে অন্য যে-কোনও ভাষায় অনুবাদ করে দিতে পারে । অনেক চেষ্টা করার পর কম্পিউটারকে দিয়ে এখন অনুবাদকের কিছু-কিছু কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে ।

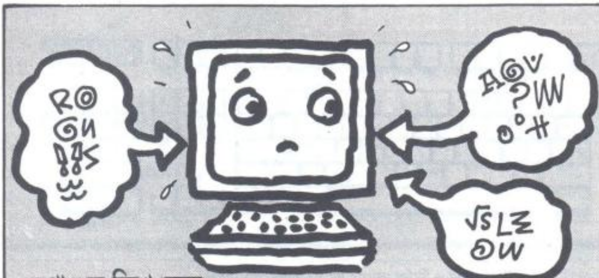

কথা শুনে লিখে ফেলে

একটা টকরাইটার তুমিও কিনে ফেলতে পারো। তুমি কোনও কথা বললে, সে তা চুপচাপ শুনে যাবে। অপেক্ষা করবে তোমার হুকুমের জন্য। তুমি যদি বলো, যা বললাম তা লিখে ফেলো, সঙ্গে-সঙ্গে সে ছাপার যন্ত্রে ঠোকাঠুকি করে তা ছেপে ফেলবে। তবে একটা কথা মনে রেখো, টকরাইটার এখনও পর্যন্ত মাত্র কয়েক হাজার চেনা-জানা শব্দ বুঝতে পারে। কোনও অপরিচিত শব্দ শুনলেই সে কিন্তু দারুণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়।

খুশিমতো আঁকতে পারো

একটা বোর্ডের ওপর তুমি একটা ছবি আঁকলে। সঙ্গে-সঙ্গে তা ফুটে উঠল কম্পিউটারের পরদায়। তা হলে কী মজাই না হয়! কোনও গ্রাফিক্স প্রোগ্রাম লেখার দরকার নেই, চাবি টিপে-টিপে কারসর সরাবার দরকার নেই। স্রেফ বোর্ডের ওপরে আঁকা ছবি বুঝে নেবে কম্পিউটার, ছবি ফুটে উঠবে পরদায়। যেসব চলচ্চিত্রে কার্টুন নড়াচড়া করে বেড়ায় মানে অ্যানিমেশন ফিল্মগুলো তৈরিতে এই ব্যবস্থা দারুণ সাহায্য করে।

ইঁদুরকে সঙ্গে নাও

সত্যিকার ইঁদুর নয়। 'ইঁদুর' বা 'মাউস' নামে ছোট্ট একটা চাকা লাগানো যন্ত্র টেবিলের ওপরে ডান দিক বাঁ দিক কি সামনে-পেছনে করে কম্পিউটারের পরদায় তীরের মতো দেখতে কারসরটিকে ইচ্ছেমতো নড়াতে পারবে। কি-বোর্ডের চাবি টিপে-টিপে একে সরানোর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি এই কাজ করা যায়।

পড়ুয়া কম্পিউটার

আমরা এক মিনিটে যতখানি পড়তে পারি, একজন পাকা টাইপিস্ট তা চার মিনিটেও লিখতে পারেন না। তাই উন্নত তথ্যপ্রয়োগ (ইনপুট) ব্যবস্থা তৈরি করতে গিয়ে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, ভাল টাইপিস্টের চেয়ে প্রায় পনেরো-কুড়ি গুণ দ্রুততায় কম্পিউটার তথ্য জেনে নিতে পারবে। অপটিকাল ক্যারেকটার রিকগনিশন এরকমই একটি। কোনও সংখ্যা বা অক্ষর পড়ে সে তাকে কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতি, 'রম'-এ জমা রাখা চরিত্রগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বুঝে নেয়।

এখন চেক বা পোস্টাল অর্ডারের নীচের দিকে নানারকম সংখ্যায় সংকেত ছাপা হচ্ছে। এগুলো চৌম্বক পদার্থ মেশানো কালি দিয়ে ছাপা হয়। কম্পিউটারের স্ক্যানার ওই সংকেত থেকে জেনে যাচ্ছে চেকের দরকারি সব খবর।

কেন বারকোড

তুমি একটা দোকানে ঢুকে পাঁচটা বই বেছে দোকানদারকে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বইটির মলাটে ছাপা লম্বা-লম্বা সরু ও মোটা দাগ দিয়ে বারকোড-এর সামনে স্ক্যানারটা রাখলেন। মুহূর্তের মধ্যে ক্যাশমেমো ছাপা হয়ে বেরিয়ে এল। ওদিকে কম্পিউটারের পরদায় ফুটে উঠল ওইসব বই, দোকানে আর কত বই আছে, আজ মোট কত টাকার বিক্রি হয়েছে এইসব তথ্য। বারকোডগুলো কম্পিউটারকে জানিয়ে দেয়, বইটার দাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, এইরকম অনেক খবর। হিসেব ও অন্যান্য কাজ সম্ভব হল কম্পিউটারের প্রোগ্রামের সাহায্যে।

কম্পিউটারের সন্ধানী

নেপচুন থেকে নানা খবরের সঙ্গে অজস্র ছবি পাঠিয়েছে ভয়েজার। সে আসলে গ্রহটাকে স্ক্যান করে পাওয়া ছবিগুলোকে অঙ্কের সংকেতে রূপান্তরিত করে ছড়িয়ে দিয়েছে।

কম্পিউটার কীভাবে এল

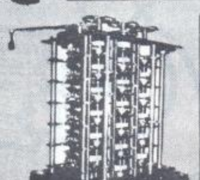

ব্যাবেজ-এর ডিফারেন্স এঞ্জিন

চার্লস ব্যাবেজ : আধুনিক কম্পিউটারের জনক

১৮২২

ডিফারেন্স এঞ্জিন।

অগাস্টা অ্যাডা: প্রথম প্রোগ্রামার

১৮৩৩

প্রথম প্রোগ্রাম করার ধারণা।

কবি বায়রনের মেয়ে অগাস্টা অ্যাডা ব্যাবেজের বান্ধবী ছিলেন। তিনিই অ্যানালিটিকাল এঞ্জিনে প্রোগ্রাম ব্যবহারের পরিকল্পনা করেন।

জর্জ বুল : বুলিয়ান অ্যালজেব্রার পথিকৃৎ

১৮৫৪

বুলিয়ান অ্যালজেব্রার শুরু।

১৮৬৯

জেভনের যুক্তিযন্ত্র।

বুলিয়ান অ্যালজেব্রার যুক্তি বা লজিককে কাজে লাগিয়ে বেশ দ্রুত কাজ করত এই যন্ত্রটি।

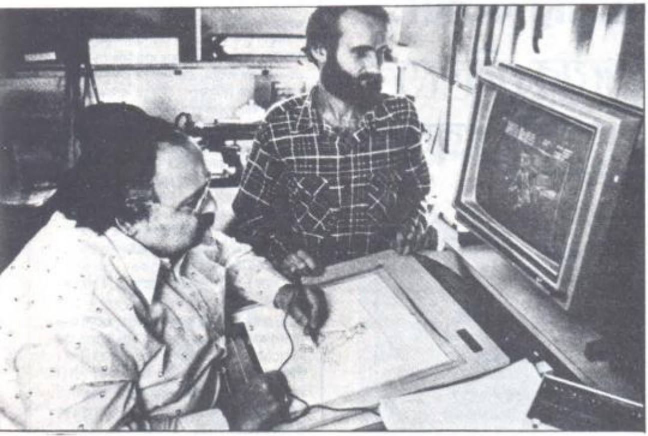

ইলেকট্রনিক বোর্ডে কোনও কিছু আঁকলেই তা ফুটে উঠছে কম্পিউটারে : অ্যানিমেশন তৈরির প্রথম ধাপ

কম্পিউটারের সন্ধানীর কাজই হল কোনও প্রাকৃতিক ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে সংকেতে পরিণত করা। সেই তথ্যকে কাজে লাগিয়ে ছবিটি তৈরি করতে ছবি পরিশোধন বা ইমেজ প্রসেসিং ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হয়।

এ ক্যামেরায় ফিল্ম লাগে না

টেপ রেকর্ডারে একটা ক্যাসেট বা চৌম্বক ফিতে ঢুকিয়ে তুমি যেভাবে গান বা আবৃত্তি রেকর্ড করো, অনেকটা সেরকমভাবেই ইলেকট্রনিক ক্যামেরায় ম্যাগনেটিক ডিস্ক ঢুকিয়ে তুমি ছবি তুলতে পারো। ছবিটাকে এই ক্যামেরা সংখ্যার সংকেত হিসেবে জমিয়ে রাখে। পরে ছবি পরিশোধন করে নিলেই পেয়ে যাবে দারুণ-দারুণ সব ছবি।

উইলিয়াম জেভন-এর লজিক মেশিন

১৮৭১

তথ্য সঞ্চয়ে মাইক্রোফিল্মের ব্যবহার শুরু।

১৮৭৪

প্রথম পিন হুইল যোজকযন্ত্র।

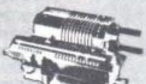

ওডনার-এর পিন হুইল অ্যাডিং মেশিন

ওডনারের তৈরি এই যন্ত্র, ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ক্যালকুলেটর।

কেলভিন-এর অ্যানালগ টাইড প্রেডিক্টর

১৮৭৯

অ্যানালগ টাইড প্রেডিক্টর।

কেলভিনের তৈরি এই যন্ত্র ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সমাধান করতে পারত।

১৮৮৫

প্রথম সফল বোতামটেপা ক্যালকুলেটর।

১৮৮৬

প্রথম বৈদ্যুতিক পাঞ্চকার্ডযন্ত্র।

ডঃ হোলেরিথের সংস্থা আমেরিকার জনগণনায় এটি ব্যবহার করে। এই সংস্থা পরে বিখ্যাত আই· বি· এম· বা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনস-এ পরিণত হয়।

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

কথা শুনছে কম্পিউটার

এর মধ্যেই কম্পিউটার মানুষের কথা শুনে কিছু-কিছু কাজ করতে শিখে ফেলেছে। বেশ কয়েক হাজার শব্দ সে আয়ত্ত করেছে। ওগুলো শুনেই কম্পিউটার বুঝতে পারে তুমি কী বলতে চাইছ। তবে অসুবিধেটা হল এরা ভীষণ প্রভুভক্ত, অন্যদের কথা আদৌ শুনতে চায় না। আসলে একই শব্দ নানা লোক নানারকমভাবে উচ্চারণ করেন বলেই এই বিপত্তি। বাড়ি বা গাড়ির দরজা খোলা থেকে শুরু করে প্লেন চালানোর ব্যাপারেও এই ব্যবস্থা এখন দারুণভাবে কাজে লাগছে।

প্রসেসর

কম্পিউটারকে দিয়ে ইচ্ছেমতো কাজ করাতে হলে তোমাকে ব্যবহার করতে হবে একটি প্রোগ্রাম বা নির্দেশমালা। কম্পিউটারকে এই নির্দেশমালা আবার অনুবাদ করে দিতে হয়

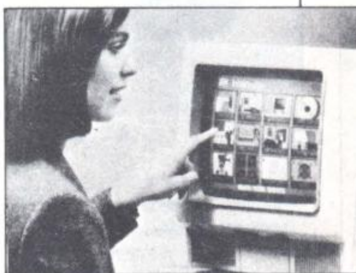

ব্যবহারিক সফটওয়্যার : পরদা ছুঁয়েই নিয়ন্ত্রণ করা যায়

যন্ত্রের ভাষায়। প্রসেসর সেই নির্দেশকে নিজের মতো বুঝে নিয়ে তা পালন করে। 'নিয়ন্ত্রণ-একক' আর 'অঙ্ক ও যুক্তির একক'— এ দুটোই প্রসেসরের সবচেয়ে দরকারি দুই অংশ। এদের সাহায্যের জন্য আছে বেশ কিছু রেজিস্টার।

নিয়ন্ত্রক আসলে কম্পিউটারের ম্যানেজার। পুরো কাজটার তদারকি করে সে। স্মৃতি থেকে সে-ই পড়ে নেবে কী করতে হবে তাকে। কাজটাকে ছোট-ছোট করে ভেঙে একটা-একটা করে অঙ্ক ও যুক্তির একককে দিয়ে করিয়ে নেয়। অঙ্ক আর যুক্তি দিয়ে সমাধান করা যায়, এই ধরনের সমস্ত সংখ্যার সমাধান করে দেয় এটি। রেজিস্টার এক্ষুনি দরকার এমন সব তথ্য ও নির্দেশগুলোকে অঙ্ক ও যুক্তির একককে জোগান দেয়। কম্পিউটারের এই এককগুলোকে জুড়ে রাখে 'বাস' নামে বিদ্যুৎবন্ধনী। তথ্য সরবরাহের বাস, 'ঠিকানার বাস' আর 'নিয়ন্ত্রণের বাস'—

একটু পরিকল্পনার ফল অনেক ভালবাসার ফসল...

এমনকি অল্প সঞ্চয়ের দৌলতে আপনার সন্তান লাখপতি ২১ বছরে!

বিনিয়োগ করুন ইউনিট ট্রাস্ট-এর শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি-তে।

আজ ও আপনার আদরের ছোট্ট সোনামণি, আপনার কোলে খুশিতে খিলখিলিয়ে খেলছে, আরাম ও নিরাপত্তা বোধ করছে। কিন্তু, অদূর ভবিষ্যতে, আগামীযুগ যখন ওর সামনে উপস্থিত হবে, ও যখন নতুন জগতে প্রবেশ করবে, কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হবে, তখন কি হবে, ভেবে রেখেছেন কি ?

আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্যে এখনই একটা পরিকল্পনা ছকে ফেলুন না। বিনিয়োগ করুন ইউনিট ট্রাস্ট-এর শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি-তে। এই যোজনার অধীনে, এক নির্ধারিত মেয়াদকালের মধ্যে অল্প স্বল্প বিনিয়োগের দৌলতে আপনার সন্তান ২১ বছর বয়সে একেবারে লাখপতি হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আপনার সন্তানকে লাখপতি বানাতে আপনি বিনিয়োগ করবেন কিভাবে ?
উত্তর : সন্তান জন্মাবার পরেই যদি আপনি শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধিতে করতে চান বিনিয়োগ, তো দেখুন খুশিমত কত নানান সুয়োগ : (১) আপনি ১৫ বছর ধরে, প্রতি বছর-বছরে ১,১০০ টাকা করে বিনিয়োগ করতে পারেন। (২) আপনি উপর্যুপরি ৩ বছরে ৩,২০০ টাকা করে এতে জমা দিন বা উপর্যুপরি ৬ বছর ধরে ১,৯০০ টাকা করে বিনিয়োগ করুন। (৩) আপনি এক থোকে ৮,৫০০ টাকাও বিনিয়োগ করতে পারেন।

প্রশ্ন : যদি বাচ্চা বড় হয়ে গিয়ে থাকে তো ?
উত্তর : দেখুন, ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি বয়সের জন্য আলাদা আলাদা পরিকল্পনা রয়েছে। শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি (CGGF) সংক্রান্ত পুস্তিকায় দেয়া চার্টে এর বিশদ ব্যাখ্যা দেয়া আছে। অনুগ্রহ করে এটির জন্যে লিখুন।

প্রশ্ন : শিশুকে কারা কারা উপহার দিতে পারেন ?
উত্তর : পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সংস্থাসমূহ বা করপোরেট বডিসমূহ।

প্রশ্ন : আপনি কমপক্ষে কত টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন ?
উত্তর : কমপক্ষে ৫০০ টাকা এবং তারপরে ১০০ টাকার গুণিতকে।

প্রশ্ন : এই বিনিয়োগ করে কত করে রিটার্ন পাবো ?
উত্তর : বার্ষিক ১২.৫% করে এবং সেইসঙ্গে প্রতি ৫ বছরে এক বোনাস ডিভিডেণ্ড।

প্রশ্ন : মেয়াদকাল পূর্তির পর আরো কোনো সুযোগ-সুবিধে আছে কি ?
উত্তর : এই টাকা তুলে নেয়ার বদলে আপনার সন্তান কাছাকাছির মাসিক আয় ইউনিট যোজনায় টাকাটা জমা দিতে পারে। (যেখান থেকে একটা মাসিক আয় হবে) বা ইউ টি আই-এর সেইসময়ে প্রাপ্তিযোগ্য যেকোনো যোজনায় বিনিয়োগও করতে পারে।

শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি (CGGF) সংক্রান্ত বিনামূল্যের পুস্তিকার জন্যে যেকোনো ইউনিট ট্রাস্ট অফিস বা প্রধান প্রতিনিধি কিংবা এজেন্ট অথবা হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম পেট্রোল পাম্প/ইণ্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আরো বিশদ জানতে এই কুপনটি ভরে ডাকযোগে নিচে দেয়া ইউনিট ট্রাস্ট-এর যেকোনো অফিসে পাঠিয়ে দিন।

আমাকে শিশু উপহার বৃদ্ধি নিধি (CGGI) সংক্রান্ত বিনামূল্যের পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।
নাম : ____________
ঠিকানা : ____________
____

ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া
(একটি সরকারি ক্ষেত্রের আর্থিক সংস্থা)

- ১৩, স্যার বিঠলদাস থ্যাকার্সী মার্গ, (নিউ মেরিন লাইন্স), বম্বে ৪০০ ০২০; ফোন : ২৮৬৩৭৬৭, ৬২০১৯৯৫
- ২ ও ৪, ফেয়ারলী প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১; ফোন : ২০৯৩৯১/২০৫০২২
- গুলাব ভবন (পেছনের ব্লক), ২য় তলা, ৬, বাহাদুর শাহ্ জাফর মার্গ, নিউ দিল্লী ১১০ ০০২; ফোন : ৩৩১৮৬৩৮/৩৩১৯৭৮৬
- জাস্টিস বশীর আহমেদ সৈয়দ বিল্ডীং, ৪৫, সেকেণ্ড লাইন বীচ্, মাদ্রাজ ৬০০ ০০১; ফোন : ৫৮৭৪৩৩/৫৮০৯৩৮

Sista's-UTI-29/90 BEN D

এই তিন ধরনের বৈদ্যুতিক সংযোগ কেন্দ্রীয় এককে থাকে।

স্মৃতি

মনে করো তোমরা একটা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলে। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান পাওয়া ছেলেমেয়েদের পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। পুরস্কার দিচ্ছেন একজন বিখ্যাত লেখক। তোমার কাজ হল বিজয়ী প্রতিযোগীদের দেওয়ার জন্য ওই লেখকের হাতে ঠিকমতো পুরস্কারগুলো এগিয়ে দেওয়া। তাড়াহুড়োর মধ্যে যাতে কোনও ভুল না হয়ে যায় তাই তুমি নিশ্চয় একটা নিয়ম মেনে পুরস্কারের প্যাকেটগুলো টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখবে।
কম্পিউটারের কাজও ঠিক এভাবেই হয়। নিয়ন্ত্রক নেয় তোমার ভূমিকা। টেবিলে নিয়ম করে সাজানো পুরস্কারগুলো যেন কম্পিউটারের স্মৃতিকোষগুলোতে সাজানো তথ্য ও নির্দেশ। তোমার হাত হল বাস। অনুপস্থিত বিজয়ীদের পুরস্কার সরিয়ে রাখার কাজও করছ তুমি। এটা যেন অঙ্ক ও যুক্তির একক। ওই লেখক তথ্য প্রকাশক বা আউটপুট ডিভাইসারের কাজ করছেন।
স্মৃতি তথ্য আর নির্দেশ জমা রাখার অদৃশ্য কুঠুরি। কম্পিউটারের দু'রকম স্মৃতি। কিছু কথা সে সহজেই ভুলে যায়। এদের নাম র‍্যাম (র‍্যান্ডম অ্যাকসেস মেমরি)। এতে তথ্য জমা রাখাও যায়, পড়াও যায়। কিন্তু রম নামে আর-একরকম স্মৃতি আছে। তা থেকে তথ্য বা নির্দেশ শুধু পড়াই যায়। ইচ্ছে করলেই তুমি এতে কোনও তথ্য জমা রাখতে পারো না। এই স্মৃতি কম্পিউটার সহজে ভোলে না।

কম্পিউটার কীভাবে মনে রাখে

ম্যাগনেটিক কোর মেমরিতে তড়িৎপ্রবাহের ফলে তৈরি চৌম্বকত্বের বিন্যাসকে কাজে লাগিয়ে কিছু তথ্য স্থায়ীভাবে কম্পিউটারের স্মরণে রাখা হয়। অর্ধপরিবাহী স্মৃতিতে (বা সেমিকন্ডাক্টর মেমরিতে) ফ্লিপফ্লপের নীতিকে কাজে লাগিয়ে তথ্য জমা রাখা হয়।
পাতলাস্তর স্মৃতিতে (বা থিন ফিল্ম মেমরিতে) খুব পাতলা একটা প্লেটে লোহা নিকেলের সংকর ধাতু দিয়ে তৈরি কিছু বিন্দু লাগানো থাকে। সঙ্গে জোড়া থাকে কিছু তার। প্রথমটির নীতিতেই এটি কাজ করে।
কিছু-কিছু পদার্থে তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে কিছু বুদ্বুদ তৈরি হয়। প্রয়োজনমতো এরা নড়াচড়াও করে। এরা আছে কি নেই তার ওপর নির্ভর করে বুদ্বুদ স্মৃতি কাজ করে।
যান্ত্রিক হলোগ্রাফিক স্মৃতি : লম্বা ও চওড়ায় এক ইঞ্চি একটা পাতে লেসার বিম ফেলে প্রায় দেড় কোটি ক্ষতচিহ্ন তৈরি করা যায়। এরাই স্মৃতি রক্ষা করে।
আলো-আঁধারির হলোগ্রাফিক স্মৃতি : থার্মোপ্লাস্টিকের ওপর বাইনারি আলো ভালভের সাহায্য নিয়ে আলো-আঁধারের নানারকম বিন্যাস তৈরি করে স্মৃতি সঞ্চয় করা হয়।
মূল স্মৃতিতে অকারণে স্মৃতির বোঝা না বয়ে বেড়িয়ে অনেক সময় কিছু তথ্য রেখে দেয় সহায়ক স্মৃতিতে। এ ছাড়াও আছে ভার্চুয়াল স্মৃতি আর কাশে স্মৃতি।
কেন্দ্রীয় এককে আর থাকে একটি ঘড়ি। তার স্পন্দনে তাল মিলিয়ে এটি কাজ করে।

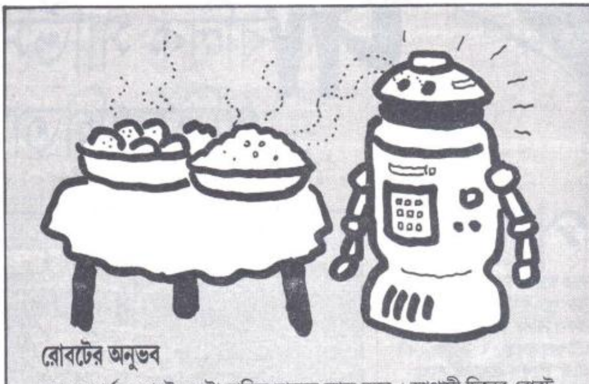

রোবটের অনুভব

এখনও পর্যন্ত রোবট একটা যান্ত্রিক হাতের কাজ করে। আগামী দিনের রোবট শব্দ, রং, স্পর্শ, এমনকী গন্ধও অনুভব করতে পারবে। কারণ, সিলিকন ধাতু শব্দ, তাপ, চাপ এবং গন্ধ খুব সহজেই অনুভব করতে পারে। তাই, সিলিকন দিয়ে তৈরি একই কম্পিউটার চিপের সাহায্যে সন্ধানী এবং কম্পিউটার—এই দুইয়েরই কাজ করাবার চেষ্টা চলছে। এই রোবট হেঁটেচলে বেড়াবে, সব ব্যাপারেই থাকবে তার প্রখর অনুভব-ক্ষমতা। তবে এই রোবট বাজারে আসতে এখনও কিছুটা দেরি আছে।

এক, দুই আর তিন বোতামের মাইস

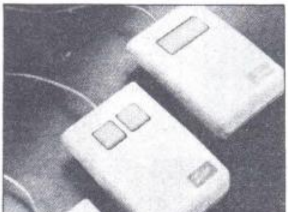

কীভাবে জমা রাখা হয় প্রচুর তথ্য

চৌম্বক ফিতে : অডিও ক্যাসেটের মতো এতে নানারকম তথ্য জমা রাখা যায়। প্রয়োজন পড়লে এটি কম্পিউটারে লাগিয়ে তথ্য বা প্রোগ্রাম পড়ে নেওয়া হয়।
ফ্লপি ডিস্ক : গান শোনার রেকর্ডের মতো এই পাতলা ডিস্কে অনেক তথ্য ও প্রোগ্রাম জমা রাখা যায়। তোমার নিজের তথ্য ও প্রোগ্রাম তোমার কাছেই রেখে দিতে পারো এই ব্যবস্থার সাহায্যে।
হার্ড ডিস্ক : অনেক ফ্লপি ডিস্কে যা ধরে তা এতে ধরে যায়। কম্পিউটারের সঙ্গে এটি সংযুক্ত থাকে।
অপটিকাল ডিস্ক : চৌম্বক মাধ্যম ব্যবহার করে এমন যে-কোনও স্মৃতি সঞ্চয়ীর চেয়ে এটি অনেক বেশি তথ্য জমা রাখতে পারে। পড়তে হয় লেসার রশ্মি ব্যবহার করে।

ছবি : দেবাশিস দেব

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগ অর্থাৎ পাবলিক সার্ভিস কমিশন সারা বছর ধরে বিভিন্ন সরকারি অফিসের নানা পদে কর্মী নিয়োগ করেন। এজন্য বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন তাঁরা। এই রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা নেহাত কম নয়। রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা মনে রেখে বিভিন্ন পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় আয়োগকে। ভাল চাকরি নিয়ে জীবিকা শুরু করতে হলে এসব পরীক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

কারা পরীক্ষায় বসতে পারবেন

ডব্লিউ· বি·সি·এস· (এক্সিকিউটিভ) পরীক্ষার আওতায় চারটি গ্রুপের অফিসারপদে লোক নিয়োগের পরীক্ষা একই সঙ্গে নেওয়া হয়। 'এ' গ্রুপের আওতায় আছে—ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, কমার্শিয়াল ট্যাক্স সার্ভিস, এগ্রিকালচারাল ট্যাক্স সার্ভিস, এক্সাইজ সার্ভিস, লেবার সার্ভিস, ফুড অ্যান্ড সাপ্লাইজ সার্ভিস, এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস, অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ। তেমনই 'বি' গ্রুপে আছে পুলিশ সার্ভিস। 'সি' গ্রুপের অধীন থাকে এন্ট্রি ট্যাক্স অফিসার, জয়েন্ট ব্লক ডিভেলাপমেন্ট অফিসার, জেলর প্রভৃতি। আর 'ডি' গ্রুপের আওতায় পড়ে সাবরেজিস্ট্রার, ইন্সপেকটর অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ ইত্যাদি। এই পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে স্নাতক হতে হবে। আর বয়স হওয়া চাই (১ জানুয়ারি তারিখের হিসেবে) ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তিনবারের বেশি পরীক্ষায় বসা যাবে না। তফসিলি

পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগ সরকারি অফিসের নানা পদে কর্মী নিয়োগ করেন। এই রাজ্যে শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা মনে রেখে নেওয়া হয় বিভিন্ন পরীক্ষা। পরীক্ষাগুলি হল :

(১) ডব্লিউ· বি· সি· এস· (এক্সিকিউটিভ)।
(২) ডব্লিউ· বি· সি· এস· (জুডিশিয়াল)।
(৩) ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস।
(৪) ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস।
(৫) মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট।
(৬) ক্লার্কশিপ এগজামিনেশন।
(৭) ইংলিশ টাইপিস্ট রিক্রুটমেন্ট এগজামিনেশন।

প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অবশ্য এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে আইনের স্নাতক অর্থাৎ ল গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। বয়স হওয়া চাই ২১ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। বার-অ্যাট্-ল প্রার্থীরাও বসতে পারবেন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে কমার্স গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট কিংবা কস্ট অ্যাকাউনট্যান্টরাও এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন। তবে প্রার্থীর বয়স যেন ১ জানুয়ারি তারিখের হিসেবে ৩০ বছরের বেশি না হয়। এই পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তিনবারের বেশি পরীক্ষায় বসা যাবে না। ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে বটানি, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, ম্যাথমেটিকস, ফিজিক্স, জুলজি, যে-কোনও একটি বিষয় নিয়ে স্নাতক হতে হবে। এ ছাড়া এঞ্জিনিয়ারিং কিংবা এগ্রিকালচারাল গ্র্যাজুয়েটও পরীক্ষায় বসতে পারবেন। প্রার্থীর বয়স হওয়া চাই ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। এই পরীক্ষায় বসবার ক্ষেত্রে দৈহিক পরিমাপের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন পুরুষ প্রার্থীদের উচ্চতা যেন কমপক্ষে ১৬৩ সেমি হয় এবং মেয়েদের ১৫০ সেমি ইত্যাদি।

মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস পরীক্ষায় যে-কোনও স্নাতকই বসতে পারেন। প্রার্থীর বয়স যেন সেই বছর ১ জানুয়ারি তারিখে ২০ বছরের কম কিংবা ৩০ বছরের বেশি না হয়।

লোকসেবা আয়োগের ইংলিশ টাইপিস্টস রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষা প্রতি বছর হয় না। এক বছর পুর পর হয়। এক বছর বাংলা টাইপিস্ট কিংবা বাংলা অনুবাদকের পদের

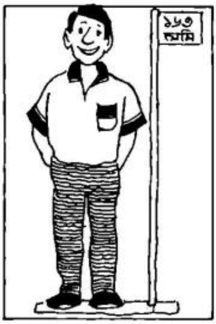

নিয়োগ পরীক্ষা হলে পরের বছর ইংরেজি টাইপিস্ট নিয়োগের পরীক্ষা হয়। এসব পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ করতে হবে এবং বয়স ৩০ বছরের বেশি হলে চলবে না। প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই তফসিলি জাতি বা উপজাতি প্রার্থীদের বয়সের আইন অনুযায়ী ছাড় আছে। তাঁরা তিনবারের বেশি পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেতে পারেন।

কোন পরীক্ষার ফি কত

ডব্লিউ· বি·সি·এস· পরীক্ষার ফি ৫৫ টাকা। যেসব প্রার্থী শুধু 'ডি' গ্রুপের জন্য পরীক্ষায় বসবেন তাঁদের দিতে হবে ৩০ টাকা। তফসিলি প্রার্থীদের ৫৫ টাকার পরিবর্তে দিতে হবে মাত্র ১৩ টাকা ৭৫ পয়সা এবং ৩০ টাকার পরিবর্তে ৭ টাকা ৫০ পয়সা। ডব্লিউ· বি·সি·এস· জুডিশিয়াল অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস, ফরেস্ট সার্ভিস প্রভৃতি পরীক্ষার ফিও একইরকম। যথাক্রমে ৫৫ টাকা এবং ১৩ টাকা ৭৫ পয়সা। সেদিক থেকে মিসলেনিয়াস পরীক্ষার ফি কিছুটা কম। সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ৩০ টাকা এবং তফসিলি প্রার্থীদের দিতে হয় ৭ টাকা ৫০ পয়সা। ক্লার্কশিপ পরীক্ষার ফি ১০ টাকা। তফসিলি প্রার্থীদের দিতে হয় ২ টাকা ৫০ পয়সা। টাইপিস্ট নিয়োগের পরীক্ষার ফি সাধারণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ টাকা এবং তফসিলি প্রার্থীদের দিতে হয় ১ টাকা ২৫ পয়সা। সব পরীক্ষার ফি ট্রেজারি চালানে কিংবা পোস্টাল অর্ডারে দেওয়া যেতে পারে।

পরীক্ষার বিষয়বস্তু

ডব্লিউ· বি·সি·এস· পরীক্ষায় ৬টি আবশ্যিক পত্রের এবং 'এ' গ্রুপের জন্য ৩টি ঐচ্ছিক পত্রের পরীক্ষায় বসতে হয়। আবশ্যিক পত্রের মধ্যে আছে—ইংরেজি রচনা এবং প্রেসি, বাংলা কম্পোজিশন এবং অনুবাদ, অঙ্ক, সাধারণ জ্ঞান ও বর্তমান ঘটনা, ইংরেজি কম্পোজিশন এবং অনুবাদ, ভারতীয় সংবিধান ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।
ডব্লিউ·বি·সি·এস· জুডিশিয়াল পরীক্ষায় আবশ্যিক ৮টি এবং ঐচ্ছিক ৩টি পত্রের পরীক্ষায় বসতে হয়। অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পরীক্ষায় আবশ্যিক ৪টি এবং ঐচ্ছিক ৩টি পত্রে পরীক্ষা দিতে হয়। আবশ্যিক পত্রের মধ্যে আছে ইংরেজি রচনা, প্রেসি, কম্পোজিশন, বাংলা রচনা, প্রেসি এবং কম্পোজিশন, সাধারণ জ্ঞান ও বর্তমান ঘটনা, কমার্শিয়াল ম্যাথমেটিকস। ফরেস্ট সার্ভিসের ক্ষেত্রে আবশ্যিক পেপার ৩টি—বাংলা (হিন্দি, উর্দু, নেপালি), সাধারণ ইংরেজি, সাধারণ শিক্ষা। এ ছাড়া আরও দুটি ঐচ্ছিক পত্রের পরীক্ষায় বসতে হয়। মিসলেনিয়াস সার্ভিস পরীক্ষার প্রথম পত্রে থাকে ইংরেজি, দ্বিতীয় পত্রে বাংলা/হিন্দি/ উর্দু/নেপালি (যার যেমন), তৃতীয় পত্রে অ্যারিথমেটিকসহ সাধারণ শিক্ষা। ক্লার্কশিপ পরীক্ষার আবশ্যিক পত্রও তিনটি।
মিসলেনিয়াস সার্ভিস পরীক্ষার মতোই। টাইপিস্ট নিয়োগের পরীক্ষার ক্ষেত্রে টাইপ টেস্ট নেওয়া হয়। প্রতি মিনিটে শুদ্ধভাবে কমপক্ষে ৩০টি শব্দ টাইপ করতে পারা চাই।
ডব্লিউ· বি· সি· এস· (এক্সিকিউটিভ) পরীক্ষায় যাঁরা 'বি' গ্রুপ অর্থাৎ পুলিশ সার্ভিসের পদের জন্য পরীক্ষায় বসবেন তাঁদের (পুরুষ প্রার্থীদের) বেলায় কমপক্ষে ১·৬৫ মিটার উচ্চতা থাকা চাই।
মেয়েদের বেলায় এই উচ্চতার পরিমাপ হবে কমপক্ষে ১·৫০ মিটার। তবে তফসিলি বা আদিবাসী প্রার্থীদের বেলায় এর হেরফের হতে পারে।
বাংলা ভাষায় লিখতে বা বলতে না পারলে ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব অর্ডিনেট ল্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিস গ্রেড-১ পদের পরীক্ষায় (গ্রুপ 'এ') বসা যাবে না। তবে কোনও প্রার্থীর মাতৃভাষা নেপালি হলে তাঁকে নিয়োগের পর এ-বিষয়ে ট্রেনিং নিতে হবে।
মেয়েরা ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব অর্ডিনেট ল্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিস পদের জন্য পরীক্ষায় বসতে পারবেন না। যাঁরা ফাইনাল ডিগ্রি পরীক্ষায় বসেছেন অথচ এই পরীক্ষায় আবেদন করার দিন পর্যন্ত ফলাফল বেরোয়নি সেক্ষেত্রে তিনি আবেদন করতে পারবেন না।
লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার পর কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্সোনালিটি টেস্টে বসতে হবে। এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিকস পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান মাধ্যমিক পরীক্ষার মতো হবে। ঐচ্ছিক পত্রের পরীক্ষার প্রশ্ন এবং

উত্তরের মান স্নাতক সাম্মানিক পরীক্ষার মতো হবে।
তফসিলি প্রার্থীদের সুবিধের জন্য সরকার ইনস্টিটিউট অব মডার্ন ম্যানেজমেন্ট (লাউডন স্ট্রিট) ডব্লিউ·বি·সি·এস·পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

পরীক্ষা-কেন্দ্র

ডব্লিউ· বি· সি· এস· পরীক্ষা নেওয়া হয় কলকাতা, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং কেন্দ্রে, সাধারণত বছরের শুরুতে, জানুয়ারি মাস নাগাদ।
ডব্লিউ· বি· সি· এস· (জুডিশিয়াল) পরীক্ষা নেওয়া হয় কলকাতা এবং দার্জিলিং কেন্দ্রে। অক্টোবর মাস নাগাদ এই পরীক্ষা নেওয়া হয়।
অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস পরীক্ষা বছরের শেষ দিকে ডিসেম্বর মাস নাগাদ কলকাতা এবং দার্জিলিং কেন্দ্রে নেওয়া হয়। ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষা নেওয়া হয় এপ্রিল মাস নাগাদ। পরীক্ষা-কেন্দ্র কলকাতা এবং দার্জিলিং। মিসলেনিয়াস পরীক্ষা নেওয়া হয় রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্র—কলকাতা, আসানসোল, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এ। সাধারণত মে মাস নাগাদ এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। ক্লার্কশিপ পরীক্ষার কেন্দ্র রাজ্যের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। যেমন কলকাতা, বারাসাত, দমদম, হাওড়া, চুঁচুড়া-চন্দননগর, বর্ধমান, বহরমপুর, মালদা, বালুরঘাট, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিং। টাইপিস্ট নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হয় কলকাতা, আসানসোল, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং কেন্দ্রে, জুলাই-অগস্ট মাসে।

কোথায় আবেদন করবেন

লোকসেবা আয়োগের কবে, কখন কোন পরীক্ষা হবে, আবেদন পত্র কোথায় পাওয়া যাবে বিস্তারিতভাবে এসব খবর জানিয়ে আয়োগ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। কয়েকটি পরীক্ষায় বসার আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হয় আয়োগের অফিস থেকে। আবার কয়েকটি পরীক্ষার আবেদন করতে হয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের প্রোফর্মা অনুযায়ী। তবে প্রার্থীদের সুবিধের জন্য আয়োগের কলকাতা অফিসে নোটিস বোর্ডে বিভিন্ন পরীক্ষার বিজ্ঞাপন যথাসময়ে টাঙিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া নানা জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে আয়োগ অফিসের একতলার কাউন্টারে। মনে রাখবেন, আয়োগের অফিস কিন্তু এখন আলিপুরের ভবানী ভবনে আর নেই। এঁদের নতুন ঠিকানা : ১৬১এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০২৬।

এশিয়াডের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন কবিতা

এশীয় ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মিট-এ রুপো জিতেছিলেন কবিতা গারারি। এশিয়াডের জন্য তিনি কেমন প্রস্তুতি নিচ্ছেন জানিয়েছেন **সুমিত দে**

কবিতা গারারি

কোচ সত্যরঞ্জন ঘোষের সঙ্গে কবিতা   ফোটো : লেখক

কাঁচরাপাড়া স্টেশন থেকে মিনিট দশেকের পথ 'কাঁপা পুকুর ধার'। পুকুর ধারের সামনের রাস্তাটা দিয়ে মিনিট-দুয়েক হাঁটলেই চোখে পড়বে কবিতাদের বাড়ি। কবিতা গারারি। বছর উনিশের শ্যামলা, ছিপছিপে, মিষ্টি চেহারার মেয়েটিকে এখন এলাকার সকলেই চেনেন একডাকে। কারণ, দিল্লিতে এশীয় ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড মিট-এ মেয়েদের ১০ কিলোমিটার হাঁটায় কবিতা শুধু রুপোই জিতে আনেননি, সেইসঙ্গে গড়ে ফেলেছেন ভারতের ইতিহাসে এক অনন্য নজির। কবিতার দৌলতেই ভারত এই প্রথম ১০ কিমি হাঁটার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কোনও পদক পেল। বাংলার যে সাতজনের দল গিয়েছিল এবার দিল্লিতে, তাতে একমাত্র কবিতাই নিয়ে এসেছেন এই পদক। রীতা সেনের দশ বছর পর—ব্যক্তিগত পদক।

শুরু সেই ১৯৮৬ সালে। তারপর থেকে টানা চারবার বাংলা ও ভারত চ্যাম্পিয়ান কবিতা। ১৯৮৮-তে সিঙ্গাপুর-এ এশীয় জুনিয়ার মিট-এ পাঁচ কিমি হাঁটায় পেয়েছিলেন ব্রোঞ্জ। এবার দিল্লিতে রুপো জিতলেন ৫০ মিনিট ৩০·৯০ সেকেন্ডে, চিনের যে মেয়ে সোনা জিতেছেন সেই চেন ইউ লিং সময় নিয়েছেন ৪৮ মিনিট ৫৯·৮৬ সেকেন্ড। সামনেই বেজিং এশিয়াড, প্রসঙ্গ এখন সেটাই। কারণ

পি টি উষা

অকল্যান্ডে এবারের কমনওয়েলথ গেম্‌স-এ ভারত থেকে একজন অ্যাথলিটকেও পাঠানো হয়নি। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে চিনের বেজিংয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়ান গেম্‌স। ভারতের প্রধান আশা-ভরসা বলতে উষা। তিনি যদি বেজিং এশিয়াডে না যান, তা হলে ভারতীয় দল দুর্বল হয়ে পড়বে। সে ক্ষেত্রে একটি পদকের জন্য কবিতা গারারির দিকে আমরা তাকিয়ে থাকতে পারি। আর একজন আছেন। সাইনি উইলসন। সোল এশিয়াডে মেয়েদের ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে সোনার পদক জিতেছিল যে-দলটি সেই দলে ছিলেন সাইনি। এবারের বেজিং এশিয়াডে সাইনি যাবেন কি না এখনও ঠিক হয়নি। সাইনি এশিয়াডে গেলে তাঁর পদক জেতার সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা কিছুটা নিশ্চিত হতে পারি। তবে এশিয়াডে ভারতের সেরা সম্ভাবনা যে পি· টি· উষা সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সেখানে কবিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে চিনের সেরা প্রতিযোগীদের সঙ্গে, যাঁরা দিল্লিতে এবার আসেননি। সুতরাং কবিতা কি পারবেন সময় কমিয়ে বেজিং থেকে পদক আনতে? প্রশ্নটা কবিতাকে করেছিলাম। উনি জানালেন, "আমি দিল্লিতেই হয়তো আরও সময় কমাতে পারতাম যদি একটা ভাল 'ওয়াকিং শু' পেতাম। বারবার কর্মকর্তাদের বলেও না পেয়ে শেষে 'ওয়ার্ম আপ শু' পরেই মিট-এ নেমেছি। হাঁটতে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছিল। যাই হোক, চিনের মেয়েটিকে দেখে রাখলাম, বেজিংয়ে কাজে দেবে। এ ছাড়া ওদের সেরা মেয়েটিকেও ওখানে পাব, সুতরাং বুঝতেই পারছি দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অপেক্ষা করছে। আমিও তৈরি। পুরোদমে সারের কাছে প্র্যাকটিস করছি। এই মুহূর্তে আমার লক্ষ্য একটাই, যেভাবেই হোক, সময়টা কমিয়ে ৪৮ মিনিট করতে হবে। আশা করছি, পারব।"

'সার' সত্যরঞ্জন ঘোষও এই আশা বুকে জমিয়ে পুরোদমে মেতে আছেন ছাত্রীদের নিয়ে। বেজিংয়ের লক্ষ্যে পলি নন্দী, চিত্রা চৌধুরী, কবিতা গারারিরা কীভাবে তৈরি হচ্ছে

সামনেই বেজিং এশিয়াড, প্রসঙ্গ এখন সেটাই। কারণ সেখানে কবিতাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে চিনের সেরা প্রতিযোগীদের সঙ্গে, যাঁরা দিল্লিতে এবার আসেননি। সুতরাং কবিতা কি পারবেন সময় কমিয়ে বেজিং থেকে পদক আনতে?

জানতে চাইলে সত্যরঞ্জন ঘোষ বললেন, "কবিতা যথেষ্ট উন্নতি করেছে। বিশেষ করে, ক্যাম্পে কোচ গুরুবক্স মেহতার কাছে ওর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। অনেক সময় কমিয়েছে। কিন্তু বেজিংয়ে আরও শক্ত পরীক্ষা। লড়তে হবে অনেক কঠিন লড়াই। ও অবশ্য সে ব্যাপারে বেশ সজাগ। খুব খাটছে। সকাল-বিকেল দু'-বেলা অনুশীলন করাচ্ছি। ওর বয়সটা কম, অ্যাকশনও খুব ভাল। তবে ওয়াকিং স্প্রিন্ট আরও বাড়াতে হবে, পা খুলতে হবে, কোমর আরও 'সুইং' করাতে হবে। এগুলো ঠিকমতো করতে পারলে আমার বিশ্বাস কবিতা বেজিং থেকেও পদক আনবে।"

পদক পাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী কবিতাও। দিল্লিতে রুপো জেতায় ৭৫ হাজার টাকা পাচ্ছেন কবিতা। টাকাটা নিয়ে কী করবেন জানতে চাওয়ায় বললেন, "আমিও শুনেছি পাব, তবে ও নিয়ে কোনও ভাবনা-চিন্তাই করছি না। আমার লক্ষ্য এখন একটাই—৪৮ মিনিট।"

বোঝা গেল, টাকা নয়, এশিয়াডে ভাল ফল করাই এখন একমাত্র লক্ষ্য কবিতার।

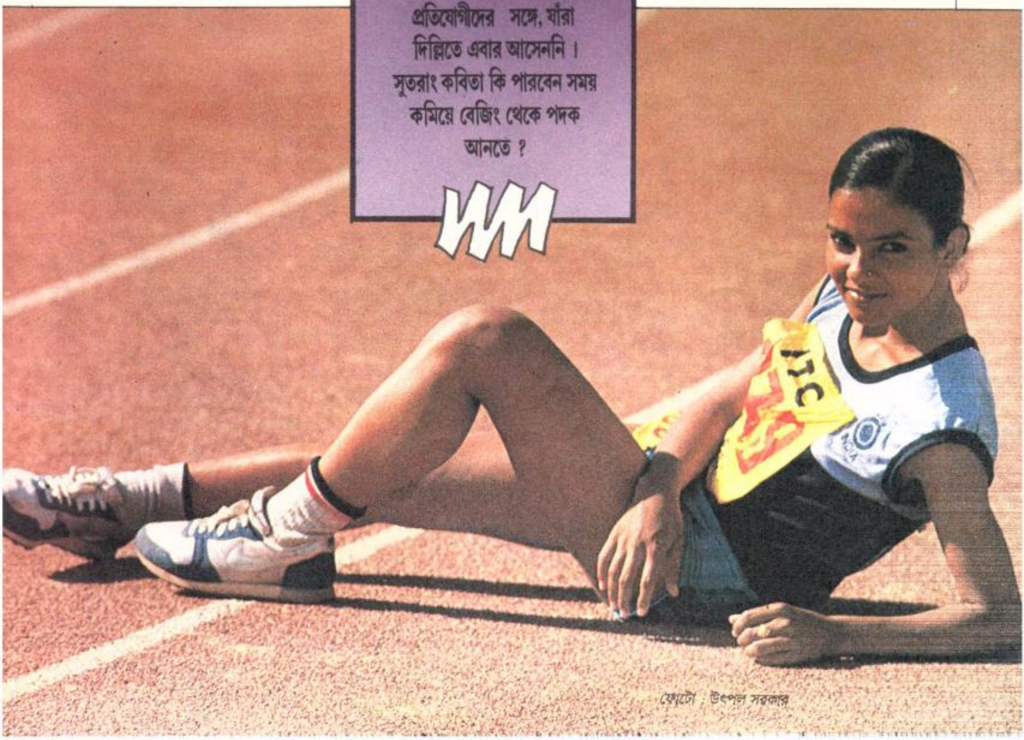

ফোটো : উৎপল সরকার

অ্যালান বর্ডার
ফোটো : উৎপল সরকার

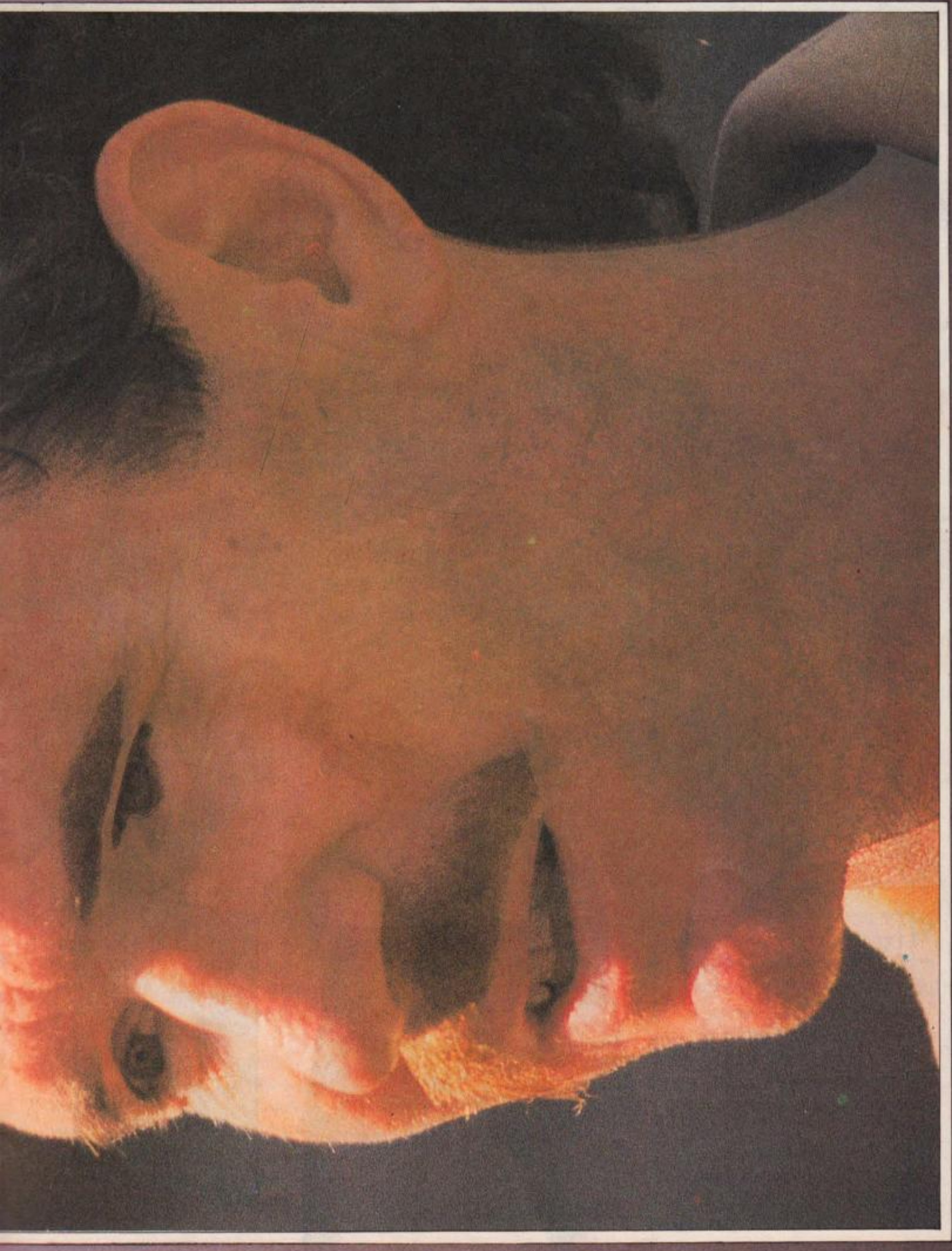

কী করে তৈরি হয় চ্যাম্পিয়ান টেনিস-খেলোয়াড়

ভারত-চ্যাম্পিয়ান জিশান আলির সাফল্যের নেপথ্যকাহিনী
শুনিয়েছেন **কৃশানু ভট্টাচার্য**

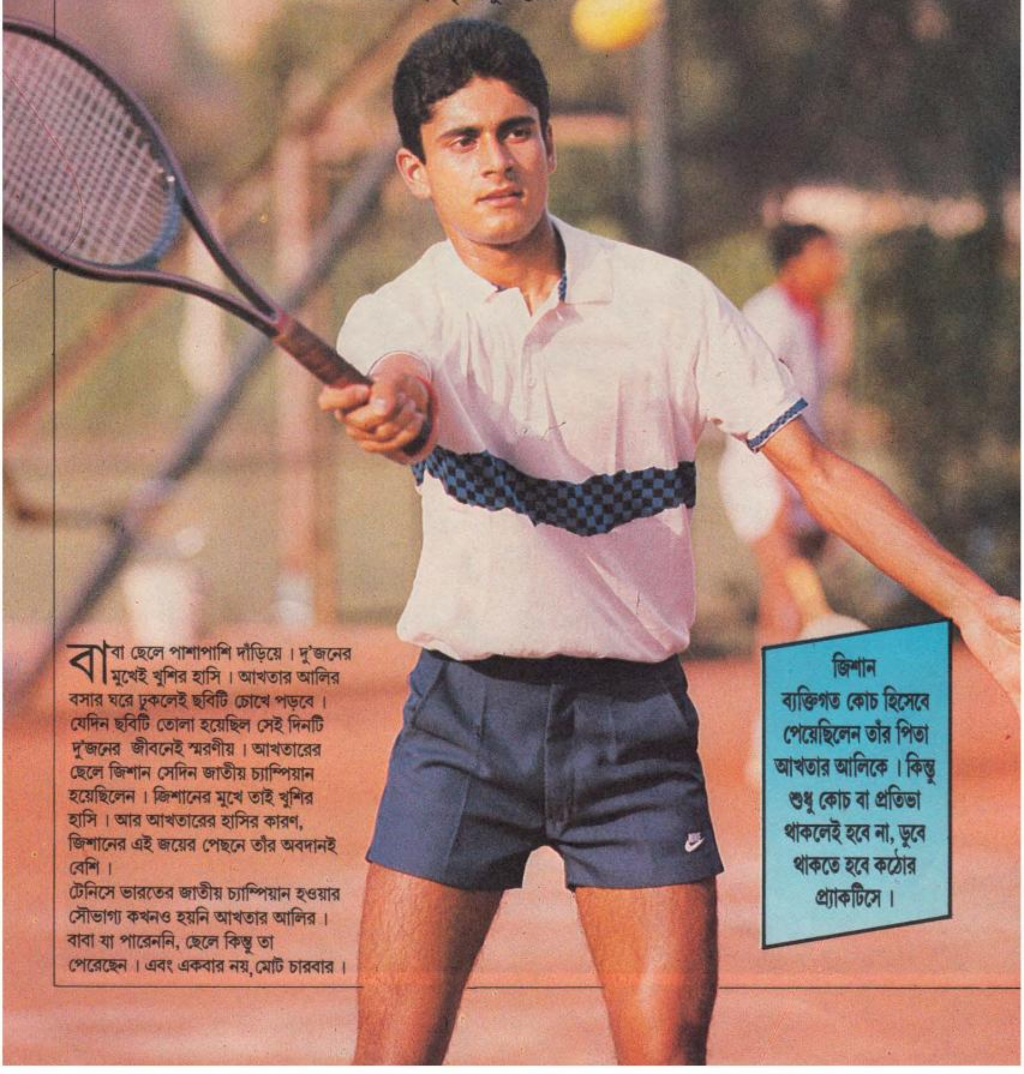

বাবা ছেলে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। দু'জনের মুখেই খুশির হাসি। আখতার আলির বসার ঘরে ঢুকলেই ছবিটি চোখে পড়বে। যেদিন ছবিটি তোলা হয়েছিল সেই দিনটি দু'জনের জীবনেই স্মরণীয়। আখতারের ছেলে জিশান সেদিন জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। জিশানের মুখে তাই খুশির হাসি। আর আখতারের হাসির কারণ, জিশানের এই জয়ের পেছনে তাঁর অবদানই বেশি।

টেনিসে ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সৌভাগ্য কখনও হয়নি আখতার আলির। বাবা যা পারেননি, ছেলে কিন্তু তা পেরেছেন। এবং একবার নয়, মোট চারবার।

জিশান ব্যক্তিগত কোচ হিসেবে পেয়েছিলেন তাঁর পিতা আখতার আলিকে। কিন্তু শুধু কোচ বা প্রতিভা থাকলেই হবে না, ডুবে থাকতে হবে কঠোর প্র্যাকটিসে।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আখতার আলি আপনার পিতা। তাঁর জন্যই কি আপনি আজ এই জায়গায় আসতে পেরেছেন?" "মুশকিল হত, খুবই মুশকিল। হয়তো বা অসম্ভবও," উত্তর দিয়েছিলেন জিশান। ভারতের ডেভিস কাপের কোচ আখতার আলির কাছে টেনিসের প্রাথমিক শিক্ষা, কলাকৌশল এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ পেয়ে যিনি আজ চারবার ভারতের জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন এবং বিদেশেও অর্জন করেছেন প্রভূত সম্মান, তিনি

ফোটো : রাজীব বসু

এ-কথা বলতেই পারেন। আসল কথা হল, আধুনিক টেনিসে সাফল্য পেতে হলে খেলোয়াড়কে নিজের কোচ রাখতেই হবে। বিয়র্ন বর্গ পেয়েছিলেন লেপার্ট বার্গেলিন-কে এবং পাঞ্চো, সেগুরা ও গঞ্জালেস -এর মতো কোচ পেয়েছিলেন কোনর্স। কোচদের ভাল টেনিস খেলোয়াড়ও হতে হবে, যাতে তাঁরা শক্ত প্র্যাকটিস করতে সমর্থ হন খেলোয়াড়দের সঙ্গে। যে-কোনও টুর্নামেন্টের আগে খেলোয়াড়কে তৈরি করে দেওয়াই হল এইসব কোচের কাজ। খেলার সময় কৌশল বদল করতে হলেও খেলোয়াড়কে নির্ভর করতে হয় কোচের ওপর। ইয়ান টিরিয়াক-কে ব্যক্তিগত কোচ রাখার পরই সাফল্য আসে বরিস বেকারের জীবনে। ব্যক্তিগত কোচ না রাখায় কখনও গ্র্যান্ড স্লাম জেতেননি বিজয় অমৃতরাজ। কিন্তু ব্যক্তিগত কোচ রাখা মুখের কথা নয়। প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। জিশানের সৌভাগ্য

জিশান কেমন খেলেন তার ওপর অনেকটা নির্ভর করছে ভারতীয় টেনিসের ভবিষ্যৎ

জিশান সম্পর্কে কে কী বলেন

জয়দীপ মুখার্জি

জিশানের সব আছে। ও প্রতিভাবান, খাটতে ভয় পায় না। ফোরহ্যান্ড বেশ ভাল, ব্যাকহ্যান্ডেও ইদানীং উন্নতি করেছে। বছর দুয়েকের মধ্যে আশা করি, ওর খেলার আরও উন্নতি হবে।

নরেশ কুমার

পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে রমেশ ও জিশানই এখন ডেভিস কাপে ভারতের সেরা খেলোয়াড়। জিশানের ওপর আমার পুরো আস্থা আছে। ও আরও পরিণত হবে।

বিজয় অমৃতরাজ

রমেশের পরে জিশানই আমাদের ভরসা। ছেলেটা খাটিয়ে। ইদনীং খেলছেও ভাল। ওর ওপর আমার পুরো বিশ্বাস আছে। জিশান আরও ভাল খেলুক, এটাই চাই।

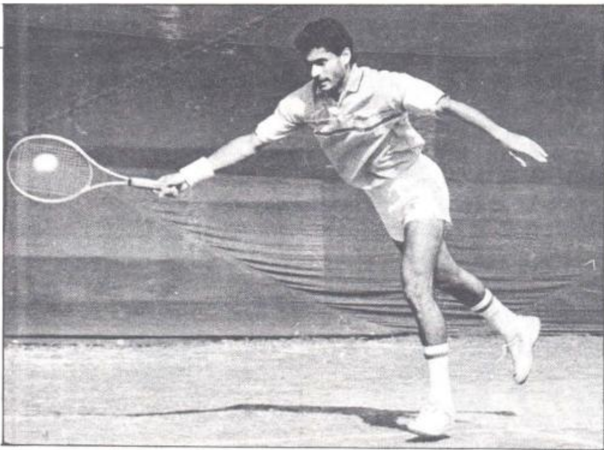

গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব জিততে হলে জিশানের দরকার কঠোর অনুশীলন

ব্যক্তিগত কোচ হিসেবে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতাকে। কিন্তু শুধু কোচ বা প্রতিভা থাকলেই হবে না, সেই সঙ্গে ডুবে থাকতে হবে কঠোর প্র্যাকটিস ও ট্রেনিংয়ে।
রড লেভার যখন ১৯৬১-তে উইম্বলডন জিতলেন তখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কয়েক বছর আগেও তাঁকে কেউ আমল দিতেন না এবং তিনি জুনিয়ার উইম্বলডন ফাইনালে হেরে গিয়েছিলেন রন হোল্মবার্জ-এর কাছে। কীভাবে এত দ্রুত তিনি তাঁর খেলার উন্নতি করলেন? উত্তরে লেভার বলেছিলেন, "জুনিয়ার উইম্বলডন জেতার পর হোলম্বার্জ ও অন্যরা লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।
টেনিস খেলার ফাঁকে-ফাঁকে তারা সব কিছুই করেছে। আমি স্কুলে না গিয়ে পড়ে থাকতাম টেনিস কোর্টে। ঘন্টার পর ঘণ্টা কড়া প্র্যাকটিসের ফলই উইম্বলডন জয়। আমার ধ্যানজ্ঞানই ছিল টেনিস।"
ঘটনাটির উল্লেখ করতে হল এই কারণে যে, শুধু প্রতিভাই টেনিসে শেষ কথা নয়। টেনিস কোর্টে ঘাম রক্ত না ঝরালে বড় মাপের খেলোয়াড় হওয়া অসম্ভব। "ছেলেবেলায় জিশান খুব একটা পরিশ্রমী ছিল না। সকালে ঘুম থেকে ওকে ওঠানো ছিল একটা সমস্যা। কিন্তু আমিও ছাড়তাম না। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ওকে তুলতাম। কোর্টে একটু প্র্যাকটিস করেই বসে পড়ত। তখন ওকে বোঝাতাম, উদাহরণ দিতাম বড়-বড় খেলোয়াড়দের।" আখতার আলি জানিয়েছেন। জিশান পরবর্তী কালে বুঝতে পারেন প্র্যাকটিসের গুরুত্ব। তিনি প্র্যাকটিসের সময়সীমা বাড়িয়ে দিলেন। ঘুম থেকে তখন আর তাঁকে ডেকে তুলতে হত না।

কিন্তু প্র্যাকটিস তো সব টেনিস খেলোয়াড়রাই করে। কিন্তু ভারতে রমেশের পরই কেন জিশানের স্থান?
আসল কথা হল, বিশ্ব টেনিসে মোটামুটি একটা জায়গায় পৌঁছতে হলে বিদেশে কোচিং নিতেই হবে। অস্বীকার করে লাভ নেই, ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খেলাধুলোয় ভারতের চেয়ে অনেক এগিয়ে। বিজ্ঞানসম্মত ট্রেনিং, খেলার উন্নত মানের সাজসরঞ্জাম, সুষম খাদ্য—এসব না হলে বড় খেলোয়াড় হওয়া যায় না।
জিশানের প্রাথমিক শিক্ষার পর আখতার বুঝেছিলেন বড় টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে জিশানকে গড়ে তুলতে হলে আমেরিকায় বিশ্বসেরা কোচ হ্যারি হপম্যান-এর স্কুলে ওঁকে পাঠাতেই হবে।
হপম্যানের স্কুলে যাওয়ার ফলেই রমানাথন কৃষ্ণান পরপর দু' বছর উঠেছিলেন উইম্বলডন টেনিস টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে।
আন্তর্জাতিক আসরে জয়দীপ মুখার্জি, প্রেমজিৎলাল বা রমেশ কৃষ্ণানের সাফল্যের মূলেও সেই হপম্যান। ফলে ১৯৮৪ ও পরের বছর আবার হপম্যানের স্কুলে জিশানকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কোর্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলত প্র্যাকটিস। হপম্যানকে ফাঁকি দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না। চারদিকে ছড়ানো থাকত তাঁর লোকজন।
রক্ত-জল-করা প্র্যাকটিসের ভয়ে পরবর্তীকালে অনেকেই পালিয়ে এসেছিলেন হপম্যানের স্কুল থেকে। যেমন প্রেমজিৎলাল। কোর্ট থেকে প্র্যাকটিসের পর যখন বেরোতেন রমানাথন, তখন দেখা যেত তিনি টলছেন। আবার রমেশকে কোর্ট থেকে বের করে আনাটাই ছিল কঠিন।
হপম্যানের স্কুলে ট্রেনিংয়ের পরেও নিস্তার ছিল না। হ্যারির স্ত্রী লুসি জিশানের অলক্ষ্যে তাঁর ঘর 'সার্চ' করতেন। উদ্দেশ্য জিশান লুকিয়ে কোনও মাদক দ্রব্য নিচ্ছেন কি না অথবা খারাপ কোনও বই পড়ছেন কি না তা জানা। হপম্যান বিশ্বাস করতেন, বড় টেনিস খেলোয়াড় হতে গেলে শুধু পরিশ্রমই যথেষ্ট নয়। সৎ হওয়াও প্রয়োজন।
হপম্যানের শিক্ষা যে বিফলে যায়নি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ জিশান। বিনয়ী, নম্র স্বভাবের জিশান হপম্যানের স্কুল থেকে ফিরে এসেই হন জাতীয় চ্যাম্পিয়ান।
হপম্যানের মৃত্যুর পর সুযোগ পলেই জিশান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন নিউকোম্বের স্কুলে ট্রেনিং নিয়েছেন। সারা বছরই খেলে বেড়ান বিশ্বের প্রায় সব দেশে। আর এসবের 'নিট' ফল হল টানা চার বছর তিনিই ভারতসেরা।
"এসে যাবে, বিশ্বের প্রথম এগারোজনের মধ্যে এসে যাবে," জিশান সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন হপম্যান। তারপর? "কিন্তু তারপরই হবে মুশকিল। তখন প্র্যাকটিস, আরও প্র্যাকটিস না করলে আর এগোতে পারবে না।" ভারতীয় টেনিসের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে জিশান কেমন খেলেন তার ওপরে।

জিশানের জয়যাত্রা

১৯৮৪ থেকে প্রতি বছর ঘরে বাইরে অন্তত দুটি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে আসছেন জিশান।
১৯৮৪ : জাতীয় টেনিসের সিনিয়ার বিভাগের ডাবলস চ্যাম্পিয়ান। ফ্লোরিডায় ১৪ বছরের কমবয়সীদের বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানশিপে পান সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান। পুরস্কারটি জিশান গ্রহণ করেন স্ট্যান স্মিথের হাত থেকে।
১৯৮৫-'৮৬ : জুনিয়ার এশিয়া-বিজয়ী, ১৮ বছরের কমবয়সীদের প্রতিযোগিতায় পৌঁছন ফাইনালে। জাপানের ফুজিসাওয়ায় আন্তর্জাতিক গ্রেড ওয়ান প্রতিযোগিতা 'জাল কাপ' জেতেন।
১৯৮৭-'৮৮ কানাডিয়ান ও ইউ এস জুনিয়ার ডাবল্‌স ও স্লোওয়ালেট (বেলজিয়াম) সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান ও তিনটি ঘরোয়া স্যাটেলাইট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী।
১৯৮৯-'৯০ জাপান স্যাটেলাইট সিঙ্গল্‌স রানার আপ ও ডাবল্‌স চ্যাম্পিয়ান।
১৯৮৬-'৮৯ টানা চার বছর জাতীয় চ্যাম্পিয়ান। খেলছেন ডেভিস কাপে।

বিশ্বকাপ মাতাবেন কি রবার্তো বাগিও

একুশ বছরের এই তরুণকে বলা হচ্ছে 'ইউরোপের মারাদোনা' । আসন্ন বিশ্বকাপে তাঁর ওপর ভরসা রেখেছেন ইতালির দর্শকরা । **সন্দীপ বসুর** প্রতিবেদন

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই 'হিরো' হয়ে গেছেন কয়েকজন । মারাদোনা তো ছিলেনই, গত বিশ্বকাপ থেকেই তিনি হিরোর মর্যাদা পেয়ে আসছেন, আর এবার আছেন হল্যান্ডের অধিনায়ক রুড গুলিট এবং দক্ষ স্ট্রাইকার মার্কো ভ্যান বাস্তেন । দু'জনেই ইউরোপের সেরা ফুটবলারের সম্মান পেয়েছেন । পশ্চিম জার্মানির সবচেয়ে দামি স্ট্রাইকার সুরগেন ক্লিন্সম্যানের প্রতিও অনেকে নজর রেখেছেন ।

মাঠ কাঁপাতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন আরও কয়েকজন । এঁদের একজন ইতালির রবার্তো বাগিও । খেলেন মিডফিল্ডে । সবে একুশ পেরিয়েছেন । মাঝমাঠে রাজত্ব করার সঙ্গে-সঙ্গে গোল করার কাজটিতেও তিনি সমান দক্ষ । অবশ্য শুধু গোল নয়, ইতালীয়দের কাছে সবচেয়ে আকর্ষক মনে হয়েছে বাগিওর খেলার ছন্দ । বছর দেড়েক আগে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে জীবনের প্রথম ম্যাচ খেলেন তিনি । ওই ম্যাচের পরই রাতারাতি তাঁর দর এবং কদর বেড়ে যায় । মাতামাতি শুরু হয় তাঁকে নিয়ে । কিছুদিন আগে বুলগারিয়াকে চার গোলে হারায় ইতালি । নিজের দেশের মাটিতে ওই ম্যাচে বাগিও দুটি গোল করেন । ইতালির একটি ক্রীড়া পত্রিকা এই ম্যাচের পর হেডিং দেয় 'বাগিওম্যানিয়া' । সেই বাগিও-জ্বরেই এখনও আচ্ছন্ন ইতালির দর্শকরা । ইতিমধ্যে তাঁকে বলা হয়েছে 'ইতালির মারাদোনা' । তুলনা করা হচ্ছে রিভেরা ও জিকোর সঙ্গে ।

বাগিওর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দু' পায়ে তিনি সমান দক্ষ । মাঝমাঠে একটু পেছন থেকে শুরু করেন ঠিকই, কিন্তু আক্রমণে যখন ওঠেন তখন স্ট্রাইকারের দক্ষতায় বিপক্ষ ডিফেন্স ভেদ করেন । সতীর্থ গিয়ানলুফা ভিয়াল্লির সঙ্গে চমৎকার বোঝাপড়ায় তিনি আক্রমণ গড়েছিলেন বুলগারিয়ার বিপক্ষে । ভিয়াল্লির খ্যাতি 'গোলগেটার' হিসেবে, দেখা গেছে বাগিওর গোলক্ষুধাও কম নয় । দেশের হয়ে যে ক'টি ম্যাচ খেলেছেন, তার প্রায় সব ক'টিতেই বাগিও গোল দিয়েছেন ।

১৯৮৬-র বিশ্বকাপের পর থেকেই যে

রবার্তো বাগিও

বাগিওর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, দু' পায়ে তিনি সমান দক্ষ । মাঝমাঠে একটু পেছন থেকে শুরু করেন ঠিকই, কিন্তু আক্রমণে যখন ওঠেন তখন স্ট্রাইকারের দক্ষতায় বিপক্ষ ডিফেন্স ভেদ করেন ।

কাঠামোয় তিনি ইতালি দলকে খেলাচ্ছেন, তাতে মাঝমাঠের খেলোয়াড়দের তিনি ইতিমধ্যেই বাছাই করে নিয়েছেন । সেখানে বাগিওর সুযোগ পাওয়াই মুশকিল । দু' দিকের দু' প্রান্তে খেলছেন ফার্নান্দো ডি নেপোলি এবং রবার্তো ডোনাডোনি, মাঝখানে গিয়াসিপি গিয়ানিনি, 'বল প্লেয়ার' হিসেবে যাঁর খ্যাতি দারুণ এবং এঁদের সাহায্য করতে আছেন হয় নিকোলা বারতি, না হয় কার্লো অ্যানসেলোত্তি । এই অবস্থায় বাগিওকে জায়গা দেবেন ভিসিনি ? তবে বিশ্বকাপের আগের মুহূর্তের ফর্মকেও নিশ্চয় উপেক্ষা করবেন না তিনি । বাগিওর ফর্ম যদি ভাল থাকে, দলে যদি তিনি সুযোগ পান তা হলে নতুন এই তারকাকে নিয়ে বিশ্বময় হইচই পড়ে যাবে ।

মাঝমাঠের লড়াই

গৌতম সরকার

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আমাদের দেশে অদ্ভুত একটা ধারণা চালু আছে, বয়স হয়ে গেলেই খেলোয়াড়কে সরে যেতে হবে। কেন ? সরকারিভাবে না হলেও আমরা এখানে মোটামুটিভাবে পেশাদারি ফুটবলই খেলি। ফুটবলে দলে ঢোকাটা যেমন লড়াই করে, তেমনই লড়াইতে হারিয়েই কোনও ফুটবলারকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। বয়স হয়ে গেলেও সে যদি সক্ষম থাকে, স্কিল ও দক্ষতায় টান না পড়ে তবে কেন সে জায়গা ছেড়ে দেবে ? এই তো কয়েকদিন আগে এই আনন্দমেলাতেই দেখছিলাম ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত গোলরক্ষক পিটার শিলটন প্রায় চল্লিশেও আগামী বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন। শিলটন বিরাট মাপের খেলোয়াড়, কিন্তু আমাদের এখানে হয়তো বয়সের অজুহাতে তাঁকেও সরে যেতে হত !

কথাগুলো বললাম এই কারণে যে, আশির দশকের শুরুতে বয়সের অভিযোগে আমিও অভিযুক্ত হয়েছিলাম। যেহেতু সত্তরের প্রথম থেকে খেলছি এবং আমার সমসাময়িক অনেকেই প্রায় খেলা ছাড়ার মুখে, সুতরাং আমারও একই পথে যাওয়া উচিত বলে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অনেকেই মত দিলেন। প্রথমে শুনে খারাপ লাগছিল, পরে ভেবে দেখলাম, এটা তো আমার কাছে মস্ত প্রেরণা ! সুতরাং অনুশীলন আরও বাড়ালাম, সারা মাঠ যাতে চষে বেড়াতে পারি তার জন্য আলাদা ব্যায়াম আর প্র্যাকটিস করতে লাগলাম। সাফল্যের দিক দিয়ে আমার ক্লাব মোহনবাগান আশির দশকের শুরুতে খুব একটা খারাপ ফল করেনি। আশিতে ফেডারেশন কাপে আমরা যুগ্ম চ্যাম্পিয়ান হলাম ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে, ডুরাণ্ড জিতলাম মহমেডানকে হারিয়ে। মহমেডান সেবার খুব শক্তিশালী, ইস্টবেঙ্গল থেকে একদল ফুটবলার সেবারই আসে মহমেডানে। স্বভাবতই ওদের হারিয়ে খুব ভাল লেগেছিল।

একাশি সালে আমরা ফেডারেশন কাপ জিতলাম ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডানকে হারিয়ে, শিল্ডে যুগ্মজয়ী হলাম ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে, রোভার্সে ফাইনালে মহমেডানকে পরিষ্কার দু' গোলে হারিয়ে দিলাম। দুটো টুর্নামেন্টে সেরা খেলোয়াড়ের সম্মান পেলাম। অর্থাৎ সৌভাগ্যবশত প্রমাণ করা গেল যে, এখনও ফুরিয়ে যাইনি। একাশিতেই প্রদীপ চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে কয়েকটি ম্যাচে আমাকে মোহনবাগান দলের অধিনায়কত্ব করতে হয়েছে। বিরাশিতেও কিছু ম্যাচে একই ব্যাপার ঘটেছে। ওই বছর ফেডারেশন কাপ আবার মোহনবাগান পেল। অর্থাৎ ফেডারেশন কাপ পাওয়ার হ্যাটট্রিক করল আমাদের টিম—আশি, একাশি, বিরাশি তিনবারই ভারত-সেরার সম্মান লাভ করলাম।

তিরাশি সালে মোহনবাগানে আমার অধিনায়কত্বের বছর খুব আনন্দে কেটেছিল। কেননা ছিয়াত্তরে আমি ক্যাপ্টেন থাকলেও ভাল খেলে ইস্টবেঙ্গল লিগ পায়নি। এবার পেলাম।

তিরাশি সাল আমার জীবনে অন্যতম স্মরণীয় বছর। ট্রোফি জয়ের জন্য নয়, আমি সরকারিভাবে মোহনবাগান দলের অধিনায়কত্বের সম্মান পেলাম। আমার কাছে এ এক দুর্লভ সম্মান। কারণ ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান, এই দুই বড় ক্লাবেরই অধিনায়কত্ব করার সৌভাগ্য হল আমার। এবং আমি যতদূর জানি, খুব কম খেলোয়াড়ই এই কৃতিত্ব লাভের সুযোগ পেয়েছে। ইস্টবেঙ্গলে অধিনায়কত্ব করি চার বছর খেলার পর ১৯৭৬ সালে, মোহনবাগানে ছ' বছর খেলার পর। খুব ভাল লাগছিল, যারা বলেছিল ইস্টবেঙ্গলের রক্ত আমার গায়ে, মোহনব্যাগানে গিয়ে খেলতে না পেরে এক বছরের মধ্যেই পালিয়ে আসব, তারা ভুল প্রমাণিত হল। মোহনবাগানে শুধু খেললামই না, অধিনায়কত্বও করলাম।

সেবার অনেকগুলো ট্রোফি হাতছাড়া হল, কিন্তু লিগ পেলাম। এটাতেও খুব তৃপ্তি পেলাম, কারণ ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়কত্বের বছরে ভাল খেলেও লিগ পাইনি। এবার পেলাম। লিগে 'আনলাকি' ক্যাপ্টেনের বদনাম ঘুচল।

এই আনন্দ, তৃপ্তির মধ্যে কে জানত সেবারই আমার মোহনবাগানে শেষ বছর এবং পরের বছরই খেলা ছাড়ব। (ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

বর্ডারের কৃতিত্ব

অধিনায়ক হিসেবে অ্যালান বর্ডার-এর শুরুটা ভাল হয়নি। নিজে ভাল খেলেও বহুবার দলের পরাজয় আটকাতে পারেননি। এমনকী, একটা সময় বর্ডার দলের অধিনায়কত্বও ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেই বর্ডারের মতো অধিনায়ক এখন বিশ্ব-ক্রিকেটে নেই। ১৯৮৯-র জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত বর্ডারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া দল টানা ১৪টি ম্যাচে অপরাজিত আছে। ইয়ান চ্যাপেলের অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়া একটানা ১৩টি ম্যাচে অপরাজিত ছিল। ডন ব্রাডম্যানের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া টানা ১৫টি ম্যাচে হারেনি। ডনের রেকর্ড

স্পর্শ করতে বর্ডারের আর একটি ম্যাচ বাকি। এ-ব্যাপারে বিশ্বরেকর্ডটি আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখলে। একটি ম্যাচ বাদ দিয়ে ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বে একটানা ২৭টি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অপরাজিত ছিল। লয়েড আহত থাকায় ১৯৮৪-এর মার্চে পোর্ট-অব-স্পেনের সেই ম্যাচে খেলেননি। অধিনায়ক ছিলেন ভিভ রিচার্ডস। আর এখন বর্ডার প্রমাণ করলেন, প্রাথমিক ব্যর্থতা বড় নয়। পরাজয়ে ভেঙে পড়লে চলবে না। পরাজয়ই মানুষকে কঠিন-কঠোর করে তোলে। বর্ডার এ পর্যন্ত ৫১টি টেস্টে অধিনায়কত্ব করেছেন। ১৩টি টেস্ট জিতেছেন, হেরেছেন ১৩টি টেস্ট। অমীমাংসিত ২৪। তাঁর সাফল্যের শতকরা হিসেব ঠিক ৫০।

এই দশকের টেনিস

নব্বইয়ের দশকে টেনিস কেমন হবে এ-নিয়ে রীতিমত গবেষণা করেছেন ডেভিড হিগ্‌ডন। তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে 'টেনিস' নামের বিখ্যাত পত্রিকায়। এই দশ বছরে পুরুষ ও মহিলা টেনিস-খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্য, উচ্চতা, মানসিকতা, এমনকী তাঁদের পোশাক-আশাক, র‍্যাকেট কেমন হবে, এ সবকিছুই তাঁর গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হিগ্‌ডন কিন্তু বলেছেন, কে কতটা জোরে বল মারছেন তা দিয়ে খেলোয়াড়দের মান বিচার করা যাবে না। আন্দ্রে আগাসির ফোরহ্যান্ড আজকের টেনিসের সবচেয়ে বড় অস্ত্র নয়। ১৯৮৮-তে ম্যাটস ভিল্যান্ডার সম্পর্কে জে বাজরি যা বলেছিলেন সেটা এখনও প্রযোজ্য। ভিলান্ডারের আছে প্রখর বুদ্ধি। সেটাই টেনিসের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। অনেকের ধারণা, গত বছর

বরিস বেকার যে টেনিসের একেবারে শীর্ষস্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন তার কারণ, বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে তিনি অনেক পরিণত হয়েছেন। তার সঙ্গে মিশেছে তাঁর কোচ বব ব্রেট-এর টেনিস-বুদ্ধি। বেকারের সাফল্যের এটাই বড় কারণ। ব্যাকহ্যান্ড সম্পর্কে হিগ্‌ডন জানিয়েছেন, ১৯৮৭-তে এক হাতে স্লাইস ব্যাকহ্যান্ড শটে ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলেন ভিল্যান্ডার। বেকার স্লাইস ব্যাকহ্যান্ডে মেশাচ্ছেন টপস্পিন। স্লাইস ব্যাকহ্যান্ডে প্রচণ্ড দখল আছে স্টেফি গ্রাফ-এর। বিয়র্ন বর্গ সত্তরের দশকে ও ক্রিস এভার্ট আশির দশকে দু' হাতে টপস্পিন ব্যাকহ্যান্ডে ভেলকি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু হিগ্‌ডনের ধারণা, এক হাতে স্লাইস ব্যাকহ্যান্ড এই দশকে দারুণভাবে ফিরে আসবে। ১৯৮৯-এর শেষ দিকেই এই প্রবণতা চোখে পড়েছে। লেন্ডল, বেকার, এডবার্গকেও এই শট মারতে দেখা যায়।

গুলিট খেলছেনই

মাঝখানে আর-একটি মাস। তারপরই বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে সারা পৃথিবী মেতে উঠবে। ইতালিতে বিশ্বকাপ চূড়ান্ত পর্যায়ের এই খেলাগুলি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শিবিরে সাজো সাজো রব উঠেছে। কোন দেশ কীরকম প্রস্তুতি নিচ্ছে তারও কিছু-কিছু আগাম খবর পাওয়া যাচ্ছে। এক-একটি দেশের সমর্থকরা তাঁদের প্রিয় খেলোয়াড়দের নিয়ে এখন থেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। ১৯৩৪-এও বিশ্বকাপের আসর বসেছিল ইতালিতে। হল্যান্ডের হাজার হাজার সমর্থক সেবার ইতালিতে ভিড় করেছিলেন। অনেকে এমনকী সাইকেলে করে গিয়েছিলেন হল্যান্ডের খেলা দেখতে। সেবার হল্যান্ড ৩—২ গোলে সুইজারল্যান্ডের কাছে হেরে যায়। ইতালির সেবারের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা কিন্তু ভুলে যেতে চান হল্যান্ডের সমর্থকরা। হল্যান্ড দল এবার সব দিক থেকেই প্রস্তুত। এমনকী,এবার তারা কয়েকজন রাঁধুনিও সঙ্গে নিয়ে যাবে। দলের খেলোয়াড়দের জন্য হল্যান্ড থেকে বিমানে নিয়মিত পাঠানো হবেপানির, ডিম, আলু, স্যালাড ও রুটি। এবং রান্নার মসলা। হল্যান্ড দলের ডাক্তার ফ্রিত্‌স কেসেল ইতিমধ্যেই ইতালি ঘুরে এসেছেন। কোন কোন হোটেলে খেলোয়াড়দের রাখা হবে তা তিনি নিজে সরেজমিনে দেখেছেন। তিনি চান এমন জায়গায় খেলোয়াড়দের রাখা হোক, যেখানে পর্যটক ও সমর্থকদের ভিড় থাকবে না। যাতে খেলোয়াড়রা পুরোপুরি বিশ্রাম পান সেইজন্য এই ব্যবস্থা করতে হবে। হল্যান্ড দলকে রাখা হবে একটি পাহাড়চূড়ায় সার্ডিনিয়ান হোটেলে।

এদিকে, বিশ্বের এক নম্বর স্ট্রাইকার মার্কো ভ্যান বাস্তেন জানিয়েছেন, "আমাদের কৌশল যদি ঠিক থাকে তা হলে এবার বিশ্বকাপ না জেতার কোনও কারণ আমি দেখছি না।" কিন্তু রুড গুলিট কি খেলতে পারবেন ? তাঁর গোড়ালি ও হাঁটুর আঘাত নিয়েই সবাই চিন্তিত। গত ছ' মাসে দু'বার তাঁর অপারেশন হয়েছে। তিনি না খেললে বিশ্বকাপ ফুটবলের আকর্ষণই কমে যাবে। তবে, হল্যান্ড দলের ম্যানেজার লিব্রেগ্‌ট্‌স দারুণ একটা খবর শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "গুলিটকে যদি ক্রাচ নিয়েও থাকতে হয়, তা হলেও ওকে আমি দলে রাখব। মাঠে ও মাঠের বাইরে ও নেতা। নেতা হিসেবে গুলিটকে দরকার।"

ডাক্তার-ক্রিকেটার

হায়দরাবাদের ক্রিকেটার এম ভি শ্রীধর রঞ্জি ট্রোফিতে ১৪ মাসে এক হাজার রান করে ভারতীয় রেকর্ড গড়েছেন। ১৯৮৮-র ১৭ ডিসেম্বর শ্রীধর প্রথম রঞ্জি ম্যাচ খেলেন। ১৯৯০-এর ১৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্জাবের বিরুদ্ধে তিনি এক হাজার রান পূর্ণ করেন। শ্রীধর ১৪টি ইনিংস খেলে এই রেকর্ড করলেন। এর আগের রেকর্ড ছিল বোম্বাইয়ের রুসি মোদির। মাত্র আটটি ইনিংসে তিনি এক হাজার রান পূর্ণ করলেও ক্যালেন্ডারের হিসেবে তাঁর সময় লেগেছিল বেশি। শ্রীধর লেখাপড়া ও খেলা— দুটোতেই সমান পারদর্শী। তিনি ডাক্তার।

খেলাধুলো

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

হিজি জোদান এতে

কয়েকটি সংখ্যায় আমি 'সুতো উচি' বা হাতের চেটোর বাইরের প্রান্তভাগ দিয়ে আঘাত করার বিভিন্নরকম পদ্ধতিতে নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার একটি নতুন পদ্ধতি প্রতিপক্ষকে আঘাত করার কৌশল নিয়ে আলোচনা শুরু করব। এই পদ্ধতির জাপানি নাম 'এমপি' বা 'হিজি', বাংলায় এর অর্থ হল কনুই দিয়ে আঘাত করার পদ্ধতি। এর আগে প্রতিপক্ষকে আঘাত করার বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন জুকি বা পাঞ্চ, সুতো বা চপ নিয়ে আলোচনায় বলেছি এগুলোর প্রয়োগ সম্ভব যখন প্রতিপক্ষ একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে। এবং যদি প্রতিপক্ষ বেশ কাছাকাছি থাকে তা হলে কনুই দিয়ে আঘাত করার মারার পদ্ধতি খুব সহজে প্রয়োগ করা সম্ভব। আমি আগেই বলেছি যে, ক্যারাটে হল খালি হাতে আত্মরক্ষার পদ্ধতি, কিন্তু ক্যারাটেতে শরীরের প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই প্রতিপক্ষের মার আটকানো এবং প্রতিপক্ষকে প্রতি-আক্রমণে কাজে লাগে। প্রতিপক্ষ কাছে থাকলে কনুই প্রতিপক্ষকে আঘাতের জন্য এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কনুই নিয়ে আঘাত খুবই জোরালো হতে পারে ঠিকমতো জেনে আঘাত করতে পারলে। কনুই দিয়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আঘাত করা যায়। প্রথমে যেটা নিয়ে আলোচনা করব জাপানি ভাষায় তার নাম 'হিজি জোদান এতে'।

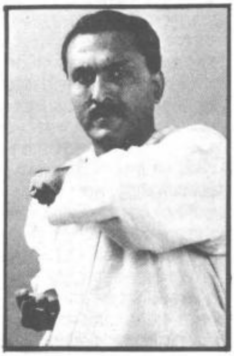

হিজি জোদান এতে : হিজি জোদান এতে-র অর্থ হল কনুই দিয়ে মুখে আঘাত করা। মুখে আঘাত করা মানে অনুশীলনের সময় চোয়াল লক্ষ্য করে মারা অভ্যাস করা। আগেই বলেছি, কিওকুশিন ক্যারাটেতে হাতের যে-কোনওরকম ব্যবহার (মার আটকানোর বা মারার) সবই মোটামুটি সানচিন দাচি থেকেই অনুশীলন করা হয়। সেইমতো প্রথমে ইওইদাচি তারপর ঠিকভাবে সানচিন দাচিতে দাঁড়াতে হবে। এবার হাত দুটো দুই পাঁজরে (ডান হাত ডান পাঁজরে, বাঁ হাত বাঁ পাঁজরে) স্পর্শ করে দাঁড়াতে হবে। এবার বাঁ হাতটা কনুই থেকে মুড়ে বাঁ কনুই মুখের সামনে চোয়ালের উচ্চতায় রেখে দাঁড়াতে হবে। সেইসঙ্গে বাঁ হাতের মুঠো ডান কাঁধের ওপর থাকবে। মুঠো থাকবে নীচের দিকে। এবার ডান হাত দিয়ে শুরু করতে হবে। শুরু করার সময় ডান হাতের মুঠো ওপর দিকে থাকবে। এবার ডান কনুই ঘুরিয়ে পেছন থেকে সামনে প্রতিপক্ষের (কাল্পনিক) চোয়াল লক্ষ্য করে মারতে হবে, সেইসঙ্গে ডান হাতের মুঠো ডান পাঁজরের কাছ থেকে বাঁ কাঁধের ওপর এসে থামবে। ডান মুঠো মাটির দিকে ঘুরে যাবে। যখন প্রথম সানচিন দাচি অবস্থা থেকে শুরুর অবস্থায় আসবে, শরীরের ওপর ভাগ সোজা থাকবে। তারপর যখন কনুই দিয়ে আঘাত (হিজি উচি) শুরু করবে তখন বাঁ হাত শরীরের ওপর ভাগ কোমর থেকে ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে যাবে। ডান হাত দিয়ে মারার সময় শরীরের ওপর ভাগ কোমর থেকে বাঁ দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে যাবে। একবার ডান হাত তারপর বাঁ হাত—এইভাবে প্রতিহাতে কুড়িবার করে অভ্যেস করতে হবে। বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন হাতের মুঠো দুটো বেশ শক্ত থাকে এবং কাঁধ, হাত শরীরের সঙ্গে যেখানে যুক্ত, সেখানকার পেশি যেন মারার সময় সহজ সাবলীল থাকে। প্রতিপক্ষকে মারার আগে পেশি শক্ত করার অভ্যাস করা উচিত।

ফোটো : উৎপল সরকার

মরসুমের প্রথম খেলায় প্রচণ্ড হারের পরে নতুনভাবে দল গড়ে রয় কারফোর্ড সিটিতে খেলতে এসেছে। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে রোভার্স যখন কোনও মতে ২-১ গোলের ব্যবধান আঁকড়ে ধরে আছে, তখন গোলে প্রবীণ টাবি মর্টন ভেঙে পড়ার মুখে !
CARFORD
তোমার হয়ে গেছে, মর্টন ! গোল এবার শোধ হয়ে যাবে !
একটা বেলুনও ও আটকাতে পারবে না !
ROVERS
ইয়ায়ায়ায়া !
রোভার্সের রয়
উহহহ !
বলটা ক্রসবারে লেগেছে !
ফিরতি বলের কাছে ভিক গাথরি আগে পৌঁছল···
দারুণ বাঁচিয়েছে 'সুপারব্র্যাট' !
ভাগ্যিস রোভার্সের রক্ষণভাগ ভাল খেলছে !
হতেই হবে··· বুড়ো টাবি গোলে খেলছে ! গোলপোস্ট এবার ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে !
ভুল বললে, বক্তিয়ার···
রয়ের মনে সাম্প্রতিক ঘটনার ছবি ফিরে আসছিল···
টাবি কোনওমতে বলে আঙুল ছুঁইয়েছিল··· নইলে গোল হয়ে যেত !
ROVERS
তখন !
হ্যারিসন লম্বা থ্রো করতে যাচ্ছে !
গোলপোস্টের কাছে কারফোর্ডের এক খেলোয়াড় বল পেলে···
পিছন দিকে হেড !
ডানকান পরাজিত হয়েছে···
নননা !
3

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

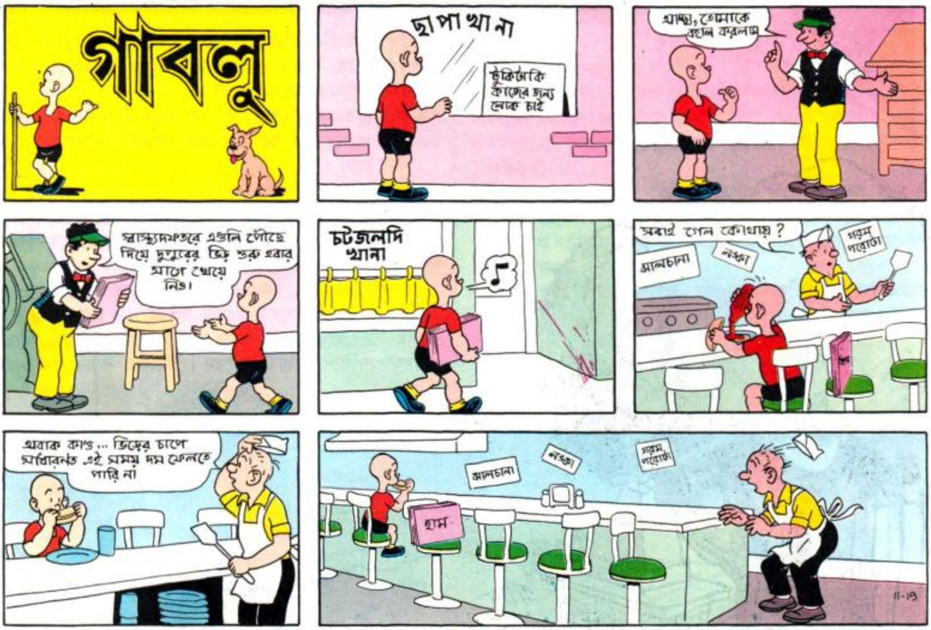
গাবলু
ছাপাখানা
ছুকিটাকি কাজের জন্য লোক চাই
আচ্ছা, তোমাকে বহাল করলাম
স্বাস্থ্যদফতরে এগুলি পৌঁছে দিয়ে দুপুরের ভিড় শুরু হবার আগে খেয়ে নিও।
চটজলদি খানা
সবাই গেল কোথায় ?
গরম পরোটা
লঙ্কা
আলুচানা
অবাক কাণ্ড ... ভিড়ের চাপে সাধারণত এই সময় দম ফেলতে পারি না
আলুচানা
লঙ্কা
গরম পরোটা
হাম
11-19

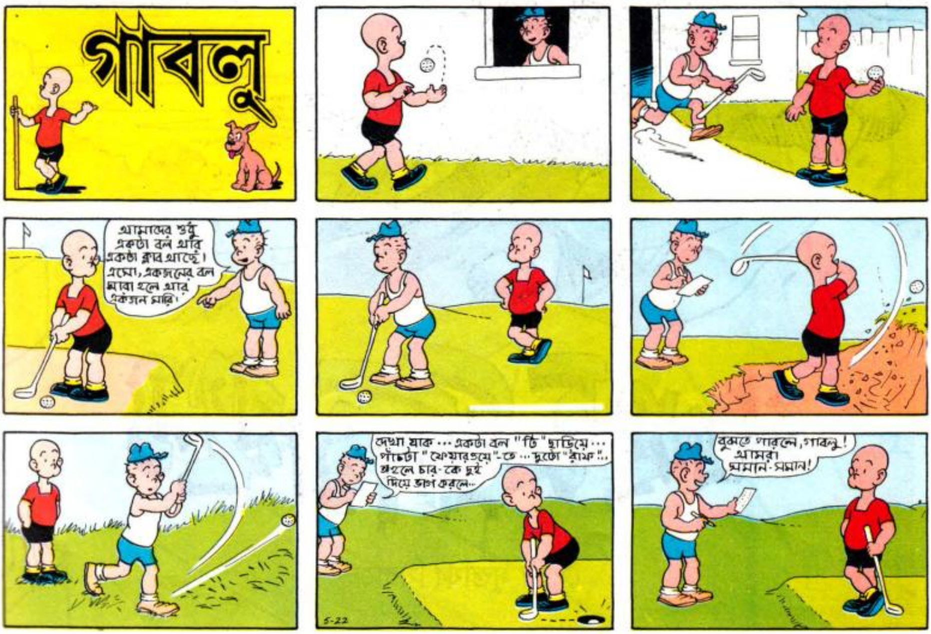
গাবলু
আমাদের শুধু একটা বল আর একটা ক্লাব আছে। এসো, একজনের বল মারা হলে আর একজন মারি।
দেখা যাক ... একটা বল "টি" ছাড়িয়ে ... পাঁচটা "ফেয়ারওয়ে"-তে ... দুটো "রাফ"... হলে চার-কে দুই দিয়ে ভাগ করলে...
বুঝতে পারলে, গাবলু! আমরা সমান-সমান!
5-22

সম্পূর্ণ উপন্যাস

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার সোফায় হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ সোজা হয়ে বসে চমকেওঠা ভঙ্গিতে বললেন, "খাইছে!"

জিজ্ঞেস করলুম, "কে কাকে খেল হালদারমশাই?"

গোয়েন্দা ভদ্রলোক উত্তেজিতভাবে বললেন, "লাফাং চু!"

"তার মানে?"

"দ্রিদিম্বা!"

বলেই কাগজটা যেমন-তেমন করে দুমড়ে রেখে হালদারমশাই সটান বেরিয়ে গেলেন। ভ্যাবাচাকা খেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিস্যু বোঝা গেল না।

এ-কথা ঠিকই যে, হালদারমশাই মাঝে-মাঝে বেমক্কা কিছু-কিছু উদ্ভুট্টে কাণ্ড করে ফেলেন। সেটা সম্ভবত ওঁর ছিটগ্রস্ত স্বভাবের দরুনই বটে। তা ছাড়া সব-তাতে নাক গলানোর অভ্যাসও আছে। একসময় পুলিশে চাকরি করতেন। রিটায়ার করার পর একটি

লাফাং চু দ্রিদিম্বা রহস্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। কালে-ভদ্রে দু'-একজন মক্কেল জোটে, অর্থাৎ 'কেস' হাতে পান। সেই কেস জটিল হলে সুখ্যাত রহস্যভেদী কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের এই জাদুঘরসদৃশ ড্রয়িংরুমে পরামর্শ নেওয়ার জন্য হাজির হন এবং ঘনঘন নস্যি নেন। এদিন সাতসকালে ওঁর আবির্ভাব দেখে অবশ্যি তেমন কিছু অনুমান করতে পারিনি। কিন্তু ওই দুর্বোধ দুটি শব্দ আওড়ে ওঁর আকস্মিক প্রস্থানের কারণটা কী?

"কী হল ডার্লিং? তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?"

ঘুরে দেখি এতক্ষণে ছাদের বাগান থেকে নেমে এসেছেন কর্নেল। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "লাফাং চু।"

বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ তাঁর সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "হুঁ। তো হালদারমশাই কোথায় গেলেন?"

"ব্রিদিস্বা।"

কর্নেল অট্টহাসি হেসে এগিয়ে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। "বোঝা যাচ্ছে খবরটা কাগজেও বেরোবে, সেটা আঁচ করতে পারেননি হালদারমশাই।"

"খবর? কিসের খবর?"

মুখে কপট ভর্ৎসনার ছাপ ফুটিয়ে কর্নেল বললেন, "তুমি একজন সাংবাদিক, জয়ন্ত! সাংবাদিক হিসেবে তোমার যথেষ্ট সুনামও আছে। অথচ আমার অবাক লাগে, নিজের পেশার প্রতি তুমি একেবারে উদাসীন।"

একটু হেসে বললুম, "হঠাৎ আমাকে নিয়ে পড়লেন কেন? হালদারমশাই…"

আমাকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, "তোমাদের 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকায় খবরটা বেরিয়েছে।"

"কত খবর বেরোয় কাগজে। সব খবর পড়তেই হবে, তার মানে নেই।" বলে হাত বাড়িয়ে কাগজটা টেনে নিলুম। হালদারমশাইয়ের ব্যাপারটা বোঝার জন্যই।

ষষ্ঠীচরণ কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে এনে টেবিলে রাখল। তারপর চোখে ঝিলিক তুলে চাপা স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "টিটিকবাবু বাথরুমে নাকি ?"

"নাহ্ ! ওঁর কফিটা বরং তুমিই গিলে ফেলো গে ষষ্ঠী।"

ষষ্ঠী ডিটেকটিভ বলতে পারে না, কিংবা হয়তো ইচ্ছে করেই 'টিটিক' বলে। কারণ সে হালদারমশাইয়ের ভাবভঙ্গি লক্ষ করে প্রচুর আমোদ পায়। কর্নেল তার দিকে চোখ কটমটিয়ে তাকাতেই সে বিব্রতভাবে বলল, "খামোকা অতটা দুধ নষ্ট। আজকাল দুধের যা আকাল। টিটিকবাবু বেশি দুধ ছাড়া কফি খান না।"

বলে সে আমার পরামর্শমতো অতিরিক্ত দুধ-মেশানো কফির পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, "ষষ্ঠী হালদারমশাইকে টিটিকবাবু বলে। জয়ন্ত, আশা করি টিকটিকি কথাটা জানো। পুলিশের গোয়েন্দাদের একসময় টিকটিকি বলা হত। সেটা ডিটেকটিভ শব্দটার ব্যঙ্গাত্মক বিকৃতি।"

"কিন্তু খবরটা কোথায় ?"

"ছয়ের পাতায় আট নম্বর কলামের মাথায়।"

খবরটা এবার চোখে পড়ল।

রায়গড়ে ভৌতিক উপদ্রব

রায়গড়, ২৩ মার্চ—সম্প্রতি এখানে এক অদ্ভুত উপদ্রব শুরু হয়েছে। গভীর রাতে অনেক বাড়ির জানালায় কে বা কারা খটখট শব্দ করে ভুতুড়ে গলায় বলে, 'লাফাং চু ড্রিদিম্বা !' কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজে কাউকে দেখা যায় না। এমনকী বাড়ির চারপাশে আলো জ্বললেও এই ঘটনা ঘটছে। সাহসী যুবকরা দলবেঁধে পাহারা দিয়েও এর কিনারা করতে পারেনি। পুলিশকে জানানো হয়েছে। কিন্তু পুলিশও এ রহস্য ফাঁস করতে ব্যর্থ হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, ২০ মার্চ রাতে থানার বড়বাবুর কোয়ার্টারেও এই ভুতুড়ে ঘটনা ঘটেছে। তিনি রিভলভার থেকে কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করেন। তাতেও কাজ হয়নি। তার ঘণ্টাটাক পরে 'বনশোভা নার্সারি'র প্রোপ্রাইটর সাধুচরণ লাহার বাড়ির জানালায় 'লাফাং চু ড্রিদিম্বা' শোনা যায়। শ্রীলাহা এবং তাঁর পরিবার প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রথমত উল্লেখ্য, এখানে গঙ্গার ধারে শ্মশানের কাছে যে প্রাচীন শিবমন্দির আছে, সেটি ঐতিহাসিক। রায়গড়ের রাজা কীর্তিমান রায় ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের বর্তমান সেবাইত পঞ্চানন আচার্য মহাশয়ের মতে, রায়গড়বাসীদের অনাচারে ক্রুদ্ধ দেবতা মহাদেব তাঁর ভূতগণকে লেলিয়ে দিয়েছেন। অবিলম্বে তাঁর তুষ্টিসাধনের জন্য মহাযজ্ঞ, বলিদানাদি পুণ্যকৃত্য আবশ্যক।

খবরটা খুঁটিয়ে পড়ার পর হাসতে হাসতে বললুম, "বোগাস ! আসলে অনেক সময় কাগজের পাতা ভরার জন্য আজেবাজে বা উদ্ভট খবর দরকার হয়। যাঁরা খবর জোগাড় করেন, তাঁরাও এই কম্মটি করে থাকেন। তা ছাড়া তিলকে তাল না করলে খবর হয় না। বিশেষ করে লোকে তো মুখরোচক খবরই চায়।"

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, "খবরটা পড়ার পর মনে হচ্ছিল, হালদারমশাইয়ের আবির্ভাব আসন্ন। কারণ ক'দিন আগে উনি ফোনে দুঃখ করে বলছিলেন, কেস-টেস একেবারে পাচ্ছেন না। জীবনটা একঘেয়ে লাগছে। দেশ থেকে রহস্য-টহস্য কমে গেলে ওঁর এজেন্সিই যে তুলে দিতে হবে। ভেবে দ্যাখ জয়ন্ত, গণেশ অ্যাভিনিউয়ে তেতলার ছাদে ছোট্ট একখানা ঘরের ভাড়া পাঁচশো টাকা ! হালদারমশাইয়ের মতো রিটায়ার্ড মানুষের পক্ষে কী সাঙ্ঘাতিক সমস্যা তা হলে !"

"কাজেই হালদারমশাই রায়গড়ের ট্রেন ধরতে গেলেন।" কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, "কিন্তু উনি আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে

অমনভাবে বেরিয়ে গেলেন, এটাই আশ্চর্য ব্যাপার।"

"একটু আগেই বলেছি, রহস্যটা যে কাগজের খবর হবে সেটা আঁচ করতে পারেননি," কর্নেল অভ্যাসমতো হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। "হুঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। ওঁর হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাকেও অবাক করেছে।"

"কিন্তু কর্নেল, তা-ই বা আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন ? এমন হতে পারে, হালদারমশাই নেহাত আড্ডা দিতেই এসেছিলেন। খবরটা পড়েই রহস্যের টানে ছুটে গেলেন। ওঁর পাগলামির কথা আমরা ভালই জানি।"

কর্নেল হাসলেন। "তুমি আসার আগেই হালদারমশাই এসেছিলেন কি না ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ওঁর মধ্যে কোনও উত্তেজনা দেখিনি।"

"তুমি লক্ষ করোনি, ডার্লিং ! উনি এসেই ষষ্ঠীকে ছাদে পাঠিয়েছিলেন আমাকে খবর দিতে। নিজেই যেতে পারতেন। যাননি, তার কারণ তোমার জানা উচিত। তুমিও এসে সোজা ছাদে চলে যেতে। কিন্তু যাওনি।"

"ছাদের দরজায় কী সব সাঙ্ঘাতিক ক্যাকটাস রেখেছেন যে !"

"হুঁ। অ্যাপোরোক্যাকটাস ফ্ল্যাজেলিফর্মিস। এই সিরিউস প্রজাতির ক্যাক্টি ব্যালকনিতে রাখার উপযুক্ত। এরা বৃষ্টি সইতে পারে না। অথচ ঠাণ্ডা পরিবেশ চাই। ভীষণ কাঁটায় ভরা, কতকটা অক্টোপাসের গড়ন। কিন্তু কী অসাধারণ লাল ফুল ফোটে। উঁকি মেরে দেখে এসো বরং।"

"প্লিজ কর্নেল !" বিরক্ত হয়ে বললুম, "হালদারমশাই এবং লাফাং চু ব্রিদিস্বা..."

হাত তুলে কর্নেল বললেন, ওই ক্যাক্টিগুলো ছাদে ওঠার মুখে রেখেছি, যাতে কেউ হুট করে গিয়ে আমাকে বিরক্ত করতে না পারে। ক্যাক্টি আর অর্কিড অনেক বেশি মনোযোগ ও সেবা দাবি করে ডার্লিং !"

"এইজন্যই সেদিন এক ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, আপনার ওই কর্নেল ভদ্রলোক ..."

"নিঃসঙ্কোচে বলো ডার্লিং ! আজ আমার মুড খাসা। ওপালটিয়া ব্রাসিলারিস ক্যাক্টির একটা কাটিং মেক্সিকোর সোনোরা থেকে আনিয়েছিলুম। দারুণ ফুল উপহার দিয়েছে। অবিশ্বাস্য !"

"ভদ্রমহিলার মতে, আপনি খুব ন্যাকা।"

কর্নেল হা-হা হো-হো হেসে বললেন, "ব্রিলিয়ান্ট ! ভদ্রমহিলা যথার্থ বলেছেন। ন্যাকা কথাটার মানে বলো তো ?"

"যে জেনেও না-জানার ভান করে।"

"হুঁ। তবে কথাটা এসেছে আরবি নেক থেকে। নেক মানে পুণ্যবান, ভালমানুষ। এক ভাষার শব্দ অন্যভাষায় ঢুকে বিকৃত হয়ে যায়। মানেও বদলে যায়। নেক থেকে নেকা। এক্ষেত্রে উচ্চারণ এবং ব্যঙ্গাত্মক অর্থবিকৃতি ঘটেছে। একা যেমন অ্যাকা।"

প্রায় আর্তনাদ করলুম, "আঃ কর্নেল !"

কর্নেল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। একটা নম্বর ডায়াল করে বললেন, "সুপ্রভাত রায়সায়েব ! কর্নেল সরকার বলছি। ... আচ্ছা, আপনার বাগানে যে একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়ি দেখেছিলুম ... হুঁ, আপনি চমৎকার নাম দিয়েছেন কুষ্মাণ্ড ক্যাক্টি... কী বললেন ? অকালকুষ্মাণ্ড ? হাঃ হাঃ হাঃ ! এনিওয়ে, ওগুলো তো রায়গড় থেকে... বনশোভা নার্সারি ? আই সি ! ... কী অবাক ! আমি কল্পনাও করিনি আপনি রায়গড়ের ঐতিহাসিক রাজাদের বংশধর। আসলে রাজবংশধররা কুমারবাহাদুর বা প্রিন্স... হুঁ, আপনি পছন্দ করেন না তা হলে। ... শুনুন, ওই অকালকুষ্মাণ্ড আমার দরকার। কীভাবে ... ধন্যবাদ। রাখছি।"

কর্নেল ফোন রাখার পর হাই তুলে বললুম, "কোনও এক রায়গড়ে ভূতের পেছনে দৌড়লেন এক ভদ্রলোক। এদিকে আর-এক ভদ্রলোক মনে হচ্ছে অকালকুষ্মাণ্ডের পেছনে দৌড়তে চলেছেন। তবে এই যোগাযোগটা অদ্ভুত রকমের আকস্মিক।"

প্রকৃতিবিদ এতক্ষণে মাথার আঁটো-টুপি খুলে টাকে হাত বুলোচ্ছিলেন। বললেন, "রহস্য জিনিসটার সঙ্গে আকস্মিকতার সম্পর্ক অনিবার্য, জয়ন্ত !"

"আপনার এই অকালকুষ্মাণ্ডে কোনও রহস্য আছে বুঝি ?"

"আছে। প্রকৃতির চেয়ে বেশি রহস্য আর কোথায় আছে ?"

"নাকি রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই সেরে নিতে চান ?"

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সোফার কাছে এগিয়ে নীচে থেকে একটা নোটবুক কুড়িয়ে বললেন, "বলেছি, তুমি হালদারমশাইকে লক্ষ করোনি। করলে চোখে পড়ত, খবরটা পড়ার পর ভদ্রলোক এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন

যে, নোটবইটার কথা ভুলে গেছেন। সম্ভবত ওটা আমাকে দেখানোর জন্য হাতে রেখেছিলেন।" কর্নেল নোটবইটার পাতা ওলটাতে থাকলেন। "তারপর আমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে কাগজ পড়ার জন্য এটা সোফায় রাখেন। এত বড় নোটবই পকেটে ঢোকানো যায় না। এটা ওঁর ডিটেকটিভ এজেন্সির নোটবই মনে হচ্ছে। যাই হোক, খবরটা পড়ার পর হঠাৎ উঠে দাঁড়ানো এবং চলে যাওয়ার সময় নোটবইটা নীচে পড়ে যায়।...হুঁ! এই তো! একটা বেনামি চিঠির কপি ছাড়া এটা আর কী হতে পারে? মূল চিঠিটা....জয়ন্ত! ফোনটা ধরো।"

টেলিফোন বাজছিল। সাড়া দিতেই হালদারমশাইয়ের গলা ভেসে এল। "জয়ন্তবাবু নাকি? কর্নেলসারকে দিন না, প্লিজ!"

"আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?"

"হাওড়া স্টেশন। আর কইবেন না! নোটবই ফ্যালাইয়া আইছি।"

"ওটা আপনার কর্নেলসারেরই হাতে রয়েছে।"

"ওঁকে ফোনটা দিন! ট্রেনের সময় হয়ে গেছে।"

হালদারমশাই পূর্ববঙ্গীয় ভাষাতেও কথা বলেন মাঝে-মাঝে। বিশেষ করে উত্তেজনার সময়। ফোন কর্নেলকে দিলুম। কর্নেল বললেন, "হুঁ, বলুন হালদারমশাই!...বলেন কী!... মক্কেলের নিষেধ? ঠিক আছে। সব পেশাতেই কিছু এথিক্স বা নীতি মেনে চলা হয়। আপনি ডিটেকটিভ। কাজেই... না, না! আপনার কাজ আপনি করুন। ...গোপনে যোগাযোগ রাখবেন? বেশ তো! ...ঠিক আছে উইশ ইউ গুড লাক।..."

ফোন রেখে কর্নেল গম্ভীর মুখে ঘুরে দাঁড়ালেন। বললুম, "কী ব্যাপার?"

কর্নেল নোটবইয়ের একটা পাতা আমার সামনে তুলে ধরলেন। হালদারমশাইয়ের হস্তাক্ষরে লেখা আছে:

> *২৬ মার্চ রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে। তার মধ্যে ত্র্যম্বক না পেলে আদরের নাতি বিশু বলিদান হবে। আবার বলা হচ্ছে, ত্র্যম্বক রেখে আসবে শ্মশানবটের গোড়ায় চৌকো পাথরটার ওপর। পুলিশকে জানালে শিবেরও সাধ্য নেই তোমাকে বাঁচায়। আর-একটা কথা। লাফাং চু ব্রিদিম্বা দিয়ে কাজ হবে না। ওই ভূতটাকে আমরা চিনি। তাকে ফাঁদ পেতে ধরব। সাবধান।*

পড়ার পর বললুম, "সর্বনাশ! কিডন্যাপ কেস মনে হচ্ছে যে!"

কর্নেল আস্তে বললেন, "হ্যাঁ। পঞ্চানন আচার্যের নাতি বিশুকে কারা গুম করে রেখেছে।"

"ত্র্যম্বক তা হলে নিশ্চয় কোনও দামি জিনিস?"

"ত্র্যম্বক শিবের এক নাম। তবে কথাটার মানে, যে-দেবতার তিনটে চোখ আছে।" কর্নেল নোটবইটা নিয়ে তাঁর ইজিচেয়ারে বসলেন। "আমাদের হালদারমশাই নিজের পেশার ব্যাপারে খুব মেথডিক্যাল। ফোনে আমাকে ওঁর মক্কেলের নাম জানাতে চাইলেন না। বললেন, নিষেধ আছে। কিন্তু নোটবইয়ে নাম-ঠিকানা সবই লেখা আছে দেখছি।"

"ওঁর মক্কেল সেই শিবমন্দিরের সেবাইত পঞ্চানন আচার্য, সে তো বোঝা-ই যাচ্ছে!"

"নাহ্‌ জয়ন্ত!" কর্নেল একটু হাসলেন। "নাতি কিডন্যাপ্‌ড্‌ হয়েছে যাঁর, তিনি মোটেও হালদারমশাইয়ের কাছে আসেননি। সম্ভবত তাঁর

আকাশে ওড়ার কথা □ পঁচিশ — ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

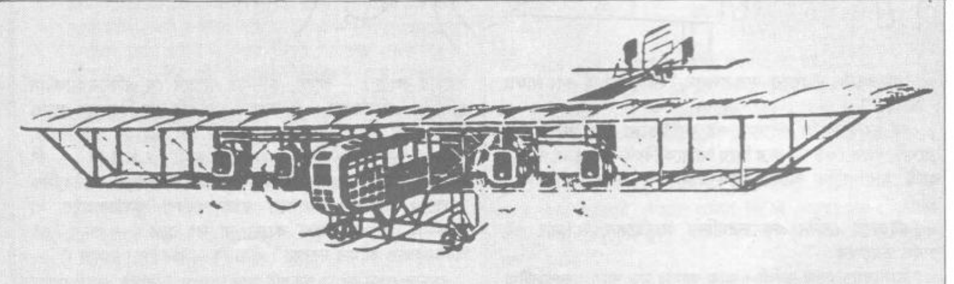

ইলিয়া মোরুমেৎস বিমান

১৯১৫ : প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের রুশ বিমান

রাশিয়া যখন যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন তার বিমানবাহিনী ছিল খুবই দুর্বল, মাত্র ১৫০টি বিমান। এর বেশিরভাগই ছিল ফ্রান্স থেকে কেনা মোরেন, ফারমান, ভয়সিন প্রভৃতি শিক্ষণ-বিমান। যুদ্ধের আগেই বিশ্ববিখ্যাত বিমান-নির্মাতা ইগর সিকরস্কি বিশ্বের প্রথম চার এঞ্জিন-যুক্ত বিমান নির্মাণ করেন। রাশিয়ার এক বিখ্যাত বীরের নামে বিমানটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইলিয়া মোরুমেৎস'। বিমানটি প্রথম আকাশে ওড়ে ১৩ মে ১৯১৩ সালে। এটি পরের বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে ১৬ জন যাত্রী নিয়ে ৬৫০০ ফিট উচ্চতায় উড়ে বিশ্বের অলটিচ্যুড রেকর্ড ভাঙে। বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রায় ৮০টি মোরুমেৎস বিমান নিয়ে তৈরি হল বিশ্বের প্রথম বোমারু বিমান স্কোয়াড্রন। জার্মানির বিরুদ্ধে ৪০০ আক্রমণ-অভিযানে মাত্র দুটি মোরুমেৎস বিনষ্ট হয়।

বিমানের বিশদ বিবরণ :

নির্মাতা : ইগর সিকরস্কি ও আর বি ভি জেড।
লম্বায় : ৫৬·১ ফিট বা ১৭·১০ মিঃ।
ডানার আয়তন : ৯৭·৯ ফিট বা ২৯·৮০ মিঃ।
গতিবেগ : ঘণ্টায় ৭৫ মাইল বা ১২১ কিমি।
একটানা ওড়ার ক্ষমতা : ৫ ঘণ্টা।
বিমানকর্মী : ৭ জন।
অস্ত্রসম্ভার : ৪-৭ মেশিনগান ও ১১৫০ পাউন্ড বা ৫২২ কেজি বোমা।
এঞ্জিন : চারটি ১৫০ অশ্বশক্তির সানবিম।

জানার কথাও নয় যে, কে কে হালদার নামে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছেন। হালদারমশাইয়ের মক্কেল হলেন রায়সায়েব, যাঁর সঙ্গে একটু আগে ফোনে কথা বললুম। বালিগঞ্জ লেনের প্রমোদরঞ্জন রায়। ভদ্রলোক ইন্টারন্যাশনাল হর্টিকালচারাল সোসাইটির একজন মেম্বার।"

অবাক হয়ে বললুম, "ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে হয়ে গেল দেখছি!"

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন, "অবশ্য এমনও হতে পারে, রায়সায়েব তাঁদের রায়গড় শিবমন্দিরের সেবাইতমশাইয়ের নাতিকে সদিচ্ছাবশেই উদ্ধার করতে চেয়েছেন। হয়তো পঞ্চাননবাবুই ছুটে এসেছেন তাঁর কাছে। তাই..." কর্নেল হঠাৎ থেমে গিয়ে হেলান দিলেন ইজিচেয়ারে। চোখ বন্ধ করে রইলেন।

"কিন্তু কর্নেল, রায়সায়েব কেন হালদারমশাইকে নিজের নাম গোপন রাখতে বলবেন?"

কর্নেল চোখ বন্ধ রেখেই বললেন, "ঠিক, ঠিক। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।"

"রায়সায়েব কি হালদারমশাইয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কথা জানেন?"

"না জানলেও হালদারমশাই জানিয়ে থাকবেন। তাই..." কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। "হুঁ, রায়সায়েব চান না আমি এতে নাক গলাই। তখন ফোনে বললেন, একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়ি—সেই অকালকুষ্মাণ্ডের জন্য কষ্ট করে রায়গড়ে আমার যাওয়ার দরকার নেই। উনিই শিগগির পাঠিয়ে দেবেন।"

"তা হলে হালদারমশাই ওঁর অজ্ঞাতে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলেন?"

"হুঁ।" কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হালদারমশাই খুব মেথডিক্যাল। কিন্তু বড্ড হঠকারী। বহুবার নিজেই নিজের সাঙ্ঘাতিক বিপদ ডেকে এনেছেন, তা তো তুমিও দেখেছ। লাফাং চু দ্রিদিম্বা ভৌতিক রহস্যে আমার মাথাব্যথা ছিল না। অকালকুষ্মাণ্ডও আমি ঘরে বসে পেয়ে যাব। কিন্তু হালদারমশাইয়ের জন্য আমার ভাবনা হচ্ছে, জয়ন্ত! এই দ্যাখো না! নিজের নোটবইটাই ফেলে গেলেন এবং স্টেশনে গিয়ে সেটার কথা খেয়াল হল। এদিকে রায়সায়েবের এমন লুকোছাপারই বা কারণ কী? তিনি তো আমার পরিচয় ভালই জানেন। নাহ্ ডার্লিং! আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এটা আমার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ।"

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। বললুম, "আপনি কি এখনই রওনা দেবেন নাকি?"

"বনশোভা নার্সারিতে আমি বারতিনেক গেছি, জয়ন্ত! প্রোপাইটর সাধুচরণ লাহা আমার চেনা লোক। গঙ্গার ধারে প্রায় তিরিশ একর জমি জুড়ে ওঁর বিশাল নার্সারি। নন্দনকানন বললেই চলে। এমন নার্সারি এদেশে আর দুটি নেই। লাহাবাবু দুর্লভ প্রজাতির অর্কিড আর ক্যাক্টি গ্র্যাফটিং করে নানা জায়গায় চালান দেন।"

"ঠিক আছে। উইশ ইউ গুড লাক।"

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, "তুমিও যাচ্ছ।"

"সে কী! আমাকে যে আজ মুখ্যমন্ত্রীর প্রেসকনফারেন্সে যেতে হবে।"

"চিফ রিপোর্টারকে বাড়িতে ফোন করে জানিয়ে দাও, মুখ্যমন্ত্রীমশাইয়ের ভাষণের চেয়ে লাফাং চু দ্রিদিম্বা রহস্য পাঠকরা বেশি খাবে। বরং ফোনটা আমাকে একবার দিও। বুঝিয়ে দেব।..."

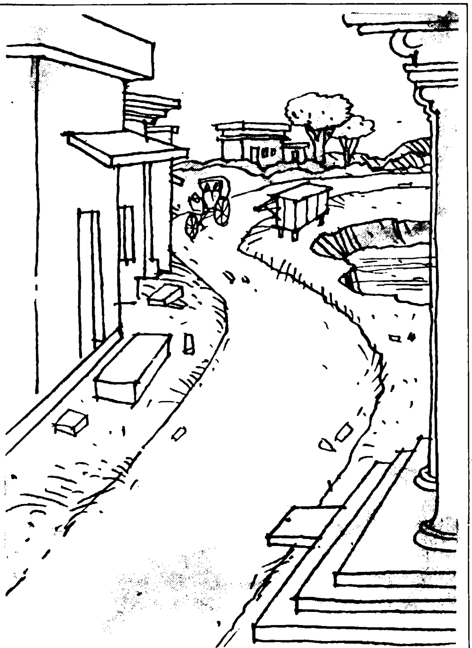

দুই

রায়গড়ে পৌঁছতে প্রায় পৌনে চারটে বেজে গেল। গঙ্গার ধারে একটা পুরনো গঞ্জের গায়ে একালের ছাপ পড়েছে। নতুন-পুরনোতে মিলে অদ্ভুত একটা চেহারা। ভিড়ভাট্টা হইচইয়ে তুলকালাম অবস্থা। আমরা একটা সাইকেলরিকশ নিলুম। বসতি এলাকা ডাইনে রেখে রিকশ যে পথে এগোল, তার দু'ধারে ধ্বংসস্তূপ আর জঙ্গল। কিছুক্ষণ পরে কর্নেল হঠাৎ বলে উঠলেন, "রোখকে! রোখকে! শিবমন্দিরে প্রণাম করে আসি। এক মিনিট।"

রিকশওয়ালা বলল, "বেশি দেরি করবেন না সার! নার্সারি থেকে আমাকে একা ফিরতে হবে। বেলা গড়িয়ে যাবে। সুনসান নিরিবিলি রাস্তা।"

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, "চোর-ছিনতাইয়ের ভয় আছে নাকি?"

রিকশওয়ালা তুম্বো মুখে বলল, "না সার! ইদানীং এখানে বাবার চেলাদের খুব উপদ্রব শুরু হয়েছে।"

"তুমি কি ভূতপ্রেতের কথা বলছ?"

রিকশওয়ালা বুকে-কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, "আজ্ঞে, ঠিকমতো সেবাযত্ন না হলে বাবা রাগেন! পেত্থম রাগ পড়েছিল ঠাকুরমশাইয়ের গিন্নির ওপর। রাত্তিরে খিড়কির দোরের কাছে ঘাড় মটকে দিয়েছিলেন। এই তো দু'মাস আগের কথা! ডাক্তার বলল, হার্টফেল। আজকাল ডাক্তারদের এই এক কথা, হার্টফেল। তবে কেউ-কেউ বলেছিল বটে মার্ডারকেস। আমি বিশ্বাস করিনে সার!"

কর্নেল ভুরু কুঁচকে কথা শুনছিলেন। বললেন, "তুমি কার কথা বলছ?"

"আজ্ঞে, এই মন্দিরের যে ঠাকুরমশাই আছেন, তেনার ওয়াইফ ছিলেন।"

"বুঝেছি। তা..."

“আর দেরি করবেন না সার ! শিগগির প্রণাম করে আসুন।”

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, “মন্দিরে এখন ঠাকুরমশাই আছেন তো ?”

“থাকার তো কথা।”

“ওঁর বাড়িতে আর কে আছেন ?”

“ওঁর নাতি বিশু। মা-বাপ মরা ছেলে সার ! ঠাকুরমশাই মানুষ করছেন। ইস্কুলে পড়ে।”

“বিশুও নিশ্চয় আছে এখন ? স্কুলের তো ছুটি হয়ে গেছে।”

রিকশওয়ালা হাসল। “বিশুকে পাওয়া কঠিন। এই আছে তো এই নেই। কোথায়-কোথায় ঘোরে টোটো করে। তবে ছেলেটা বড্ড ভাল সার !”

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, “আচ্ছা, এই লাফাং চু দ্রিদিম্বা ব্যাপারটা…”

রিকশওয়ালা আঁতকে উঠে ফের কপালে-বুকে হাত ঠেকিয়ে বলল, “ওসব কথা বলবেন না সার ! যান, যান ! প্রণাম করে আসুন। বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে।”

রাস্তা থেকে একফালি পায়ে চলা পথ এগিয়ে গেছে শিবমন্দিরের জরাজীর্ণ ফটক পর্যন্ত। দু'ধারে ধ্বংসস্তূপ ঢেকে রেখেছে ঝোপঝাড় আর কিছু উঁচু গাছ। কর্নেল যেতে যেতে চাপা স্বরে বললেন, “বোঝা গেল, বিশু কিডন্যাপ্‌ড্‌ হওয়ার কথা এখানে এখনও সম্ভবত কেউ জানে না।”

সায় দিয়ে বললুম, “আরও একটা কথা জানা গেল, সেবাইত ভদ্রলোকের স্ত্রীর মৃত্যুটা অনেকের কাছে সন্দেহজনক।”

কর্নেল বাইনোকুলার তুলে পাখি দেখার চেষ্টা করছিলেন। বললেন, “একটা নিষেধাজ্ঞা রইল জয়ন্ত, তুমি সবসময় মুখটি বুজে থাকবে—বিশেষ করে যখন আমি কারও সঙ্গে কথা বলব।”

অভিমান চেপে বললুম, “ও কে বস !”

কর্নেল হাসলেন। “না, না। অন্যান্য কথা বলবে। শুধু এই ঘটনাসংক্রান্ত কোনও কথা বাদে। তবে যখন তুমি-আমি একা থাকব, তখন যথেচ্ছ কথা বলার বাধা নেই।”

ফটক দিয়ে ঢুকে একটা চত্বর দেখা গেল। এখানে-ওখানে দেশি ফুল-ফলের গাছ। সামনে প্রকাণ্ড শিবমন্দির। ধাপ বেয়ে উঠতে হয়। ডাইনে একতলা কয়েকটা ঘর। ঘরগুলোর দরজা-জানালা বন্ধ। জুতো খুলে আমরা মন্দিরের দরজায় উঠে গেলুম। ভেতরটা আবছা অন্ধকার। কর্নেল জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট্ট টর্চ বের করে জ্বাললেন। সেই আলোয় একটি কালো পাথরের শিবলিঙ্গ দেখা গেল। সিঁদুরের ছোপ পড়েছে আগাগোড়া। কিছু মিইয়ে যাওয়া ফুল আর বেলপাতা পড়ে আছে। হঠাৎ কর্নেল টর্চ নিভিয়ে ফিসফিস করে বললেন, “প্রণাম করো ডার্লিং ! ঝটপট প্রণাম !”

উনি হাঁটু মুড়ে বসে মাথা ঠেকালে আমি অবাক হয়েছিলুম। কারণ এ যাবৎ আমার বৃদ্ধ বন্ধুকে কোথাও এমন ভক্তি প্রদর্শন করতে দেখিনি। ওঁর দেখাদেখি আমাকেও মাথা ঠেকাতে হল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে দেখি, নীচের চত্বরে এক প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছেন। লম্বাটে গড়ন। পরনে খাটো করে পরা ধুতি আর হাফ ফতুয়া। কপালে লাল তিলক। গলায় রুদ্রাক্ষমালা। খালি পা।

কর্নেল বিনীতভাবে বললেন, “আমার আন্তরিক ইচ্ছে, পুজো দিই। তা আপনিই কি এই মন্দিরের পুরোহিত ?”

“আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি !”

“বনশোভা নার্সারিতে অথবা লাহাবাবুর বাড়িতে…”

“উঁহু। গঙ্গার ধারে। আপনার গলায় সেই যন্তরটাও ঝুলছে দেখছি। কী দ্যাখেন ওই দিয়ে ?”

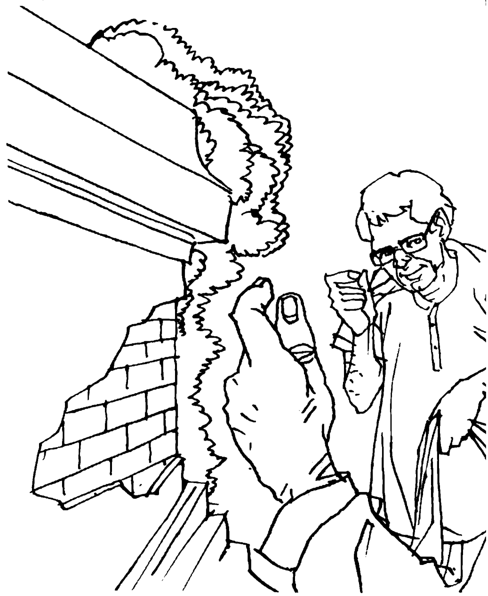

“পাখি-টাখি দেখি। পাখি দেখতে আমার ভাল লাগে ঠাকুরমশাই !”

এই ঠাকুরমশাই তা হলে সেই পঞ্চানন আচার্য। মুচকি হেসে বললেন, “আমার নাতি বিশেটারও ওই নেশা। বুঝলেন ? একটা টিয়েপাখি পুষেছিল। রাগ করে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়েছি। তাতে হতভাগার এমন রাগ যে না-খাওয়া না-দাওয়া, কোথায় উধাও। যা না যেখানে যাবি। ক'দিন কে খেতে দেয় দেখব' খন। আবার এই শর্মার পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই হবে।”

কর্নেল এবং তাঁর পিছনে আমি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলুম চত্বরে। কর্নেল বললেন, “আপনার নাতির বয়স কত ? কোন ক্লাসে পড়ে ?”

ঠাকুরমশাই বললেন, “বারো-তেরো হবে। ক্লাস সিক্সে গাড্ডা খেয়ে পড়ে আছে। আর বলবেন না মশাই ! বিশু নয়, বিচ্ছু। বুঝলেন ? কী বুঝলেন ?”

“বিচ্ছু।”

ঠাকুরমশাইয়ের চোখ দুটি কেমন ঢুলুঢুলু এবং মুখে অমায়িক ভাব। চোখ নাচিয়ে হেসে বললেন, “মশাইদের কি কলকাতা থেকে আসা হচ্ছে ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ।” কর্নেল এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে বললেন, “ছোট ছেলের এই নিরিবিলি জায়গায় একা থাকতে ভাল লাগবে কেন ? তাই হয়তো মাঝে-মাঝে কোনও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি চলে যায়। আপনি খোঁজ নিচ্ছেন না কেন ?”

পঞ্চানন আচার্য এবার একটু বিরক্ত হলেন। “ধুর মশাই ! আত্মীয়স্বজন বলতে ওর কেউ কোথাও আছে নাকি ? রায়গড়েই কারও বাড়ি গিয়ে থাকে। এবারও তা-ই আছে।”

“তা আপনি ওর পাখি খুলে দিলেন কেন ?”

“অত কৈফিয়ত দিতে পারব না মশাই !”

কর্নেল পকেট থেকে পার্স বের করে বললেন, “আগামীকাল পুজো

দেব। জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য কত অ্যাডভান্স লাগবে বলুন। আমি লাহাবাবুর নার্সারিতে আছি।"

ঠাকুরমশাই পার্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ছোট, না মাঝারি, না বড়পুজো ?"

"আজ্ঞে ?"

"ছোটপুজোর রেট পঞ্চাশ। মাঝারি পাঁচশো। বড় সাড়ে সাতশো।"

"এত তফাত কেন ?"

ঠাকুরমশাই হাসলেন। "ছোটতে নিরিমিষ। মাঝারিতে কেজি দশেক, বড়তে কেজি পনেরো থেকে বিশ। পাঁঠার যা দাম বেড়েছে, আর বলবেন না মশাই। ওই তো হাড়িকাঠ দেখতে পাচ্ছেন। অবস্থা দেখুন না ঘুণ ধরে নড়বড় করছে। মাঝারি বা বড়পুজো হলে কেতোকে খবর দিতে হবে। তাকেও মজুরি দিতে হবে।"

কর্নেল পার্স থেকে দুটো দশ টাকার নোট ঠাকুরমশাইয়ের পায়ের কাছে রেখে বললেন, "ছোটই দেব। রক্তটক্ত আমার ধাতে সয় না। এই রইল অ্যাডভান্স।"

ঠাকুরমশাই নোট দুটো দেখতে দেখতে বললেন, "আর-একটা চাই। পুজোসামগ্রীর বেজায় দর।"

কর্নেল আর-একটা দশ টাকার নোট রাখলেন। তারপর বললেন, "কখন আসব বলুন ?"

"দাঁড়ান। পাঁজি দেখে আসি।"

টাকা তুলে নিয়ে কেমন যেন ঘোরের মধ্যে হেঁটে গেলেন ঠাকুরমশাই। একতলা একটা ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। ফতুয়ার পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন। ভেতরে ঢুকে গেলেন।

চাপাস্বরে বললুম, "সত্যিই কি পুজো দেবেন নাকি ?"

কর্নেল গম্ভীরমুখে বললেন, "মাঝে-মাঝে একটু ধর্মকর্ম করলে মনে শান্তি আসে ডার্লিং।"

ঠাকুরমশাই বেরিয়ে আসছিলেন। এবার চোখে চশমা। হাতে পাঁজি। বারান্দা থেকে নামার সময় একটা শূন্য পাখির খাঁচায় মাথায় টোক্কর লাগল। অমনি 'হ্যাত্তেরি' বলে খাঁচাটা হ্যাঁচকা টানে খুলে ছুঁড়ে ফেললেন।

তারপর পাঁজির পাতা ওলটাতে-ওলটাতে এগিয়ে এলেন। "হ্যাঁ! কালবেলা গতে ছয় ঘঃ তেত্তিরিশ মিঃ চুয়াল্লিশ সেঃ মাহেন্দ্রযোগ—আপনারা সূর্য ওঠার আগেই চলে আসুন।"

কর্নেল করজোড়ে প্রণাম করে পা বাড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা, আপনি যে খাঁচাটা ফেলে দিলেন, আপনার নাতি এসে রাগ করবে না ?"

"বয়ে গেল!" ঠাকুরমশাই বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দেখালেন। "গত সপ্তায় পাখি উড়িয়ে দিয়েছি। এ-সপ্তায় খাঁচা উড়িয়ে দিলুম। পাখি ফিরে এসে থাকবে কোথায় ?" টেনে-টেনে হাসতে লাগলেন পঞ্চানন আচার্য।

"আপনার নাতি চলে গেল কবে ?"

"আজ রোববার। বেস্যুতবার ইস্কুল থেকে বিকেলে এসে বইখাতা রেখে চলে গেল।"

"বলে যায়নি কোথায় যাচ্ছে ?"

"বলল, কেতো ওর পাখি দেখতে পেয়েছে। ধরতে যাচ্ছে।"

"কেতো কে ?"

"আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। এক কোপে একশো পাঁঠা কাটে মশাই! বড়পুজো দিলে দেখতেন!"

রিকশওয়ালাকে দেখা গেল ফটকের বাইরে। মুখে তিতিবিরক্ত ভাব। ডাকল, "বড্ড লেট হয়ে গেল সার! এমন করলে চলে ? এতক্ষণ ফিরে গিয়ে আরও কয়েক খেপ পেসেঞ্জার টানতুম ইস্টিশনে।"

ঠাকুরমশাইয়ের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা গিয়ে রিকশয় উঠলুম। রিকশওয়ালা গজগজ করতে থাকল। "পাঁচুঠাকুরের পাল্লায় পড়তে আছে ? সবসময় ভাং-এর নেশায় চুর হয়ে থাকেন। কিন্তু পুজো দিতে চাইলেই টনটনে হুঁশ। শুনেছি, রায়রাজাদের যখের ধন আগলাচ্ছেন সাতপুরুষ ধরে। তবু টাকার লোভ গেল না!"

কর্নেল বললেন, "বলো কী! যখের ধন ?"

রিকশওয়ালা প্যাডেলে পায়ের চাপ দিয়ে বলল, "আজ্ঞে সার, আপনারা শিক্ষিত লোক। আপনাদের কি অজানা আছে ? শিবঠাকুরের মাথায় থাকেন সাপ। সেই সাপের মাথায় আছে এক মণি। সাতরাজার ধন কি না বলুন সার ?"

"এই মন্দিরের শিবের মাথায় তো সাপ দেখলুম না হে! ন্যাড়া শিবলিঙ্গ আছে বটে। সাপ তো নেই।"

রিকশওয়ালা দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, "আছে। ছিল। কে দেখা পায়, কে পায় না। আর মণির কথা যদি বলেন, তা-ও আছে। ছিল। যে জানার সে ঠিকই জানে।"

"কে সে ?"

"পাঁচঠাকুর। আবার কে!"

ডাইনে গঙ্গা দেখা গেল এতক্ষণে। সামনে কিছুটা দূরে বনশোভা নার্সারির গেট। দেওয়ালের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। রিকশওলা রায়রাজাদের গল্প শোনাচ্ছিল। এসব গল্পের কাঠামো দেখেছি একইরকম। ধার্মিক রাজার সামনে সশরীরে দেবতার আবির্ভাব, পুজোর নির্দেশ, বর দান এবং একটি মন্দির নির্মাণ। এই গল্পে দেবতা নিজের মাথার সাপের মণিটিও দান করেছিলেন রায়রাজাকে।

ফিসফিস করে কর্নেলকে বললুম, "ত্র্যম্বক!"

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকালেন শুধু।

নার্সারির গেটে আমরা রিকশ থেকে নামতেই কে ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যালো, কর্নেল সরকার!"

কালো তাগড়াই চেহারা, থুতনিতে দাড়ি, পরনে লাল শার্ট, জিনস আর পায়ে গামবুট, পিঠে সম্ভবত কীটনাশকের খুদে ট্যাঙ্ক বাঁধা, হাতে স্প্রের নল। এক ভদ্রলোক ফুলের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। কর্নেল তাঁকে সম্ভাষণ করে বললেন, "হ্যালো মিঃ বাগ! কেমন আছেন? আপনার কর্তাবাবু কোথায়?"

মিঃ বাগ মুচকি হেসে বললেন, "সাধুদা ভূতের ভয়ে বাড়ি থেকে নার্সারিতে আসছেন না। কাগজে খবর পড়েননি? আজই তো বেরিয়েছে। এনি ওয়ে, ওয়েলকাম! মালিক নেই তো কী হয়েছে? নোকর আপনার সেবার জন্য হাজির।"

কর্নেল বললেন, "আমার কয়েকটা একিনোক্যাকটাস গ্রুসিনিয়ি চাই। রায়সায়েবের বাগানে দেখে দৌড়ে এসেছি।"

মিঃ বাগকে হঠাৎ যেন চমকে উঠতে দেখলুম। নাকি আমার চোখের ভুল? তখনই অবশ্য সহাস্যে বললেন, "আসুন। আসুন। সে হবে 'খন। আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বিশ্রাম করুন।..."

তিন

নার্সারির একটেরে গঙ্গার ধারে বাংলোধাঁচের সুন্দর একটা বাড়ি। ম্যানেজার অরিন্দম বাগ একা থাকেন সেখানে। ভদ্রলোক একজন হর্টিকালচার-বিশেষজ্ঞ। রায়সায়েবের সুপারিশে সাধুবাবু ওঁকে বছর দেড়েক আগে বহাল করেছেন। সাধুবাবু তাই এখন রাতে রায়গড়ের বাড়িতে গিয়ে থাকেন। আগে এই বাংলোতেই থাকতেন। মান্যগণ্য অতিথি এলে তাঁদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। নার্সারির বেশির ভাগ কর্মী স্থানীয় লোক। তাঁরা সন্ধ্যায় বাড়ি চলে যান। জনাতিনেক থাকেন উলটো দিকের একতলা সারবন্দি ঘরগুলোতে। সেখানেই নার্সারির অফিস আছে। গেটের কাছাকাছি ট্রাক ও টেম্পোর গ্যারাজ আছে। রাতের পাহারার জন্য বন্দুকধারী গার্ডও আছে জনা দুই।

কফি খেতে-খেতে কর্নেল এবং মিঃ বাগ ক্যাক্টি নিয়ে দুর্বোধ আলোচনা চালিয়ে গেলেন। তারপর আমার কথা বেমালুম ভুলে দু'জনে বেরিয়ে গেলেন। সম্ভবত ক্যাক্টি পরিদর্শনে।

বেলা পড়ে এসেছে। জানলা দিয়ে গঙ্গাদর্শনেই মন দিলুম অগত্যা। এইসময় চোখে পড়ল, কর্নেলের বাইনোকুলারটা টেবিলে পড়ে আছে। তুলে নিয়ে চোখে রাখলুম। লেন্স অ্যাডজাস্ট করার পর গঙ্গার ওপার-এপার চমৎকার খুঁটিয়ে দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল, শিবমন্দিরের দিকে একটা প্রকাণ্ড বটের গাছ এবং সেটাই হয়তো সেই শ্মশানঘাট, তার তলা থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার।

গঙ্গার ধারে নিচু বাঁধে ঘন ঝোপঝাড়। সেখানে ঢুকে ঘাপটি পেতে বসে পড়লেন।

মিনিট পাঁচেক পরে একটা ডিঙি নৌকো এসে শ্মশানবটের কাছে ভিড়ল। ঝোপের আড়াল পড়ায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু হালদারমশাইকে গুড়ি মেরে এগোতে দেখলুম সেদিকে।

একটা কিছু ঘটতে চলেছে নিশ্চয়। হালদারমশাই অদৃশ্য হয়ে গেলে বাইনোকুলার নিয়ে পুবের দরজা খুলে বের হলুম। কিন্তু নিরাশ হতে হল। এদিকের গেটে তালা আঁটা আছে। বেরনো যাবে না। সবুজ রঙের লোহার কপাট অন্তত ফুট ছয়েক উঁচু। তার মাথায় গ্রিল এবং গ্রিলের ওপর কাঁটাতার। নার্সারি না দুর্গ?

ঘরের মেঝে উঁচুতে বলে জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখা যায়। তাই ঘরে ফিরে আবার বাইনোকুলারে চোখ রাখলুম।

সেই নৌকো তরতর করে চলে যাচ্ছে। কোথাও হালদারমশাইকে দেখতে পাওয়া গেল না। আলোর রং ধূসর হয়ে গেছে। সব আবছা হয়ে পড়েছে এবার।

একটু পরে কর্নেল এবং মিঃ বাগের সাড়া পেলুম। কথা বলতে বলতে দু'জনে ঘরে ঢুকলেন। মিঃ বাগ সুইচ টিপে আলো জ্বেলে বললেন, "জয়ন্তবাবু হয়তো লক্ষ করেননি আমরা মাঠেঘাটে থাকলেও সিটিলাইফের আরাম ভোগ করি।"

কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত মাঝে-মাঝে নেচারকে কাছে পেতে চায়। আমারই সঙ্গ দোষে।"

মিঃ বাগ হাসলেন, "সমস্যা হল, নেচার খুব একটা নিরাপদ কিছু নয়। এই নার্সারিতে বেজায় সাপের উৎপাত হয়। অবশ্য এখন মার্চের শেষাশেষি, সাপেদের ঘুমের শেষ প্রহর। এপ্রিলের মাঝামাঝি একবার পাশ ফিরে শোবে। তারপর মে মাসে বেরোতে শুরু করবে। জুনে তো সাঙ্ঘাতিক অবস্থা। নার্সারি ওদের কামোফ্লেজের পক্ষে চমৎকার জায়গা। গত জুনে ক্যাক্টি ভেবে একটা—নাহ, জয়ন্তবাবু ভাববেন ওঁকে ভয় দেখাচ্ছি!"

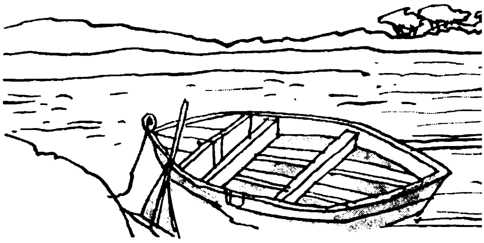

কর্নেল সকৌতুকে বললেন, "জয়ন্ত অলরেডি ভয় পেয়ে গেছে।"

মিঃ বাগ জিভ কেটে বললেন, "সরি! আচ্ছা, আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি একটু কাজ সেরে নিইগে ততক্ষণ। আর-এক দফা কফিও বলে দিচ্ছি। কর্নেলসায়েব তো ভীষণ কফিভক্ত।"

উনি চলে যাওয়ার পর কর্নেল পাশে বললেন, "তোমাকে এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন ডার্লিং? অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী ভাবছিলে?"

চাপা স্বরে হালদারমশাইয়ের ব্যাপারটা বললুম। নৌকোটার কথাও।

শুনে কর্নেল গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "হালদারমশাইয়ের কাছে রিভলভার আছে। তুমি গুলির শব্দ শুনেছ কি?"

"নাহ্।"

"অবশ্য এত দূর থেকে রিভলভারের শব্দ শোনা অসম্ভব। তবে তোমার বর্ণনা শুনে মনে হল, নৌকোতে ওঁর প্রতিপক্ষের লোক-টোকই ছিল। যদি ওঁর কোনও বিপদ না হয়ে থাকে, শিগগির আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।"

"উনি কি জানেন আপনিও এখানে এসেছেন ?"

"উনি আমাকে আসতে বলেছেন। বনশোভা নার্সারিতে থাকতে বলেছেন।"

"তখন স্টেশন থেকে টেলিফোনে তা-ই বলছিলেন বুঝি ?"

"হুঁ।"

কর্নেল চোখ বুজে দাড়ি টানছিলেন। বললুম, "এই বাগভদ্রলোককে আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। আপনি লক করেছেন কি না জানি না, তখন গেটে ক্যাক্টির কথা বলামাত্র উনি যেন চমকে উঠলেন।"

"হুঃ।"

"একটু আগে সাপের ভয় দেখাচ্ছিলেন।"

"কী খালি হুঁ-হুঁ করছেন ? খুলে আলোচনা করুন।"

কর্নেল সেই পাঁচুঠাকুরের মতো ঢুলুঢুলু চোখে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, "আমি ছোটপুজোর কথা ভাবছি, জয়ন্ত। আগামীকাল প্রত্যুষে ছয় ঘঃ তেত্তিরিশ মিঃ চুয়াল্লিশ সেঃ মাহেন্দ্রযোগ।"

"আমি কিন্তু যাচ্ছি না।"

হরি মুখে ভয়ের ছাপ ফুটিয়ে বলল, "আজ্ঞে তা-ই বটে। রাতবিরেতে জানালার বাইরে কে খোনাগলায় কী যেন বলে। আমিও শুনেছি।"

"বলো কী ? কবে শুনেছ ?"

"এই তো গত রাত্তিরে। ভয়ে কাউকে বলিনি।"

কর্নেল সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, "কিন্তু কী বলে ভূতটা ?"

হরি বলার আগে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "লাফাং চু ত্রিদিম্বা ?"

"তা-ই বটে, তা-ই বটে।" হরি আড়ষ্টভাবে হাসল। "তবে আমার মনে হয়, উনি বুড়িঠাকরুনের আত্মা। আজ্ঞে সার, অপঘাতে মরণ বলে কথা। খিড়কির দোর থেকে আর মাত্তর কয়েক-পা নামলেই মা গঙ্গা। জলে পড়লেই আত্মার উদ্ধার হত। কিন্তু বডি পড়েছিল দোরগোড়ায়।"

কর্নেল বললেন, "তুমি কার কথা বলছ হরি ?"

"আজ্ঞে পাঁচুঠাকুরের গিন্নি ছিলেন তিনি। বেজায় দজ্জাল মেয়ে ছিলেন। কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে। মারা গিয়েও লোককে জ্বালাচ্ছেন।"

"ত্র্যম্বক দর্শনের পুণ্য মিস করা উচিত নয়, ডার্লিং। না, না—আমি মহাদেবের মাথার সাপের মণি-টনির কথা বলছি না। ত্র্যম্বক স্বয়ং মহাদেব।"

আমরা চাপা স্বরে কথা বলছিলুম। এই সময় একটা লোক ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। এই লোকটা আগেরবার কফি এনেছিল। কর্নেল বললেন, "এসো হরি। তোমার জন্য হা-পিত্যেশ করছিলুম!"

হরি ট্রে রেখে সেলাম ঠুকে বলল, "একটু দেরি হয়ে গেল সার। বাগসায়েবকে কর্তামশাই ডেকে পাঠিয়েছেন। জিপগাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন বাগসায়েব। গণেশড্রাইভারকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেম। তা গণেশের এদিকে জ্বর। অগত্যা..."

"আচ্ছা হরি, এদিকের গেটের চাবি কার কাছে ? একটু গঙ্গার ধারে ঘুরতে যেতুম।"

হরি জিভ কেটে বলল, "এঃ হে। একটু আগে বললে—গেটের চাবি বাগসায়েবের কাছে থাকে। তবে সার, আমার মতে, রাতবিরেতে না বেরনোই ভাল। অবস্থা আর আগের মতো নেই। লোকে সন্ধ্যার পর আর বাইরে বেরোচ্ছে না ইদানীং।"

"ভূতপ্রেতের ব্যাপার নাকি ?"

"অপঘাতে মরণ বলছ কেন ?"

হরি সতর্ক ভঙ্গিতে চাপা স্বরে বলল, "কাউকে যেন বলবেন না সার। ভেতর-ভেতর কথাটা সবাই জানে। পাচুঠাকুর নেশাভাং করেন। রোজ একভরি আফিং তাঁর চাই। ঠাকরুনের গয়নাগাঁটি, সোনাদানা সব লুকিয়ে বেচে দিতেন। এই নিয়ে দু'জনকার ঝামেলা। শেষে নাকি দেবতার ধন পর্যন্ত বেচতে চেয়েছিলেন পাঁচুঠাকুর। বেগতিক দেখে ঠাকরুন রাতদুপুরে দেবতার ধন লুকিয়ে রাখতে যাচ্ছিলেন। পাঁচুঠাকুর ঘড়েল লোক। তক্কেতক্কে ছিলেন। যে-ই ঠাকরুন বেরিয়েছেন, অমনি পেছন থেকে গলা টিপে ধরে..."

হরি ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে থেমে গেল। কর্নেল বললেন, "কার কাছে শুনেছ এসব কথা ?"

"কর্তামশাই আর বাগসায়েব বলাবলি করছিলেন। দয়া করে ওঁদের যেন বলবেন না আমি এসব কথা বলেছি। গরিব মানুষ সার! ঘরে একদঙ্গল পুষ্যি।"

"হুঁ।" কর্নেল আস্তে বললেন, "তা হলে দেবতার ধন বেচে দিয়েছেন পাঁচুঠাকুর ? কিন্তু দেবতার ধন কিনল কে ? কিনলে তো মহাপাপ। তাই না হরি ?"

হরি একটু ইতস্তত করে বলল, "আজকাল পাপের ভয় কেউ করে

শব্দসন্ধান

রঞ্জন

১	২		৩	■	৪		৫	■	৬
৭		■	৮			■	৯		
■	১০			■	১১	১২	■	■	
১৩		■	১৪	১৫	■	১৬	১৭		
১৮		১৯	■	২০	২১	■		■	■
■	■		■	২২		■	২৩	২৪	২৫
২৬			২৭	■	২৮	২৯	■	৩০	
	■	■	৩১	৩২	■	৩৩			■
৩৪		৩৫	■	৩৬			■	৩৭	৩৮
	■	৩৯			■	৪০			

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ইনি ছিলেন এক খেয়ালি সম্রাট। (৪) সমুদ্র। (৭) ইংরেজ আমলে এঁরা ছোট বড় দুই-ই হতেন। (৮) কোনও-কোনও ফল এমন হয়। (৯) বন্ধু। (১০) কৌপীন। (১১) আরাকানের দস্যু। (১৩) অহঙ্কার। (১৪) ইনি থাকেন নজরুল ইসলামের আগে। (১৬) জয়ঢাক। (১৮) শরৎকালীন। (২০) লাগাম। (২২) যেমন কর্ম তেমন —। (২৩) প্রাচীন ক্ষেপণাস্ত্রবিশেষ। (২৬) সঙ্গী, ভৃত্য। (২৮) পৃথিবী। (৩০) বৎসর। (৩১) যা পাওনা তার চেয়ে বাড়তি কিছু। (৩৩) কটু স্বাদযুক্ত। (৩৪) ইন্দ্র। (৩৬) পুচ্ছ। (৩৭) অশুদ্ধ রাত্রি। (৩৯) ফুলবিশেষ। (৪০) মালি।

উপর-নীচ : (১) সপ্তম রাশি। (২) বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন। (৩) চোখের মণি। (৪) ভারতের একটি রাজ্য। (৫) ভীষ্ম শাপভ্রষ্ট এঁদেরই একজন। (৬) পরীক্ষার সময় অনেকের এই কাঁপুনি উপস্থিত হয়। (১২) হাতি। (১৩) অবস্থা। (১৫) আহা, অত সুন্দর লম্বা গলা, কিন্তু বোবা। (১৭) অলঙ্কার। (১৯) কার অস্থি থেকে অসুরবিনাশী ভয়ঙ্কর অস্ত্র ? (২১) পঙ্গপাল। (২৪) রসায়নঘটিত। (২৫) প্রচলন, রেওয়াজ। (২৬) এক ভাষা থেকে আর-এক ভাষায়। (২৭) মিটমাট, নিষ্পত্তি। (২৯) সংসারী ভক্তদের কাছে রামকৃষ্ণদেব যা চাইতেন। (৩২) পৃথিবীর সর্বোচ্চ সুপেয় জলের হ্রদ। (৩৫) যে বিশাল গাছ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। (৩৮) মাথা।

গত সংখ্যার সমাধান

অ	গ্নি	শি	খা	■	ন	বা	বি	■	অ
থ	■	শু	■	অ	শ্ব	■	প	ল	ক
ই	হু	দি	■	ন	র	গ	ণ	■	ষ্ট
■	■	ব	স	ন্ত	■	■	ন	র	ক
বা	য়	স	■	না	চি	য়ে	■	■	ক্ষ
দ	■	■	পা	গ	ড়ি	■	ম	য়	না
প্র	তি	মা	■	■	য়া	ও	হা	■	■
তি	■	তা	ল	পা	খা	■	মা	রী	চ
বা	হা	মা	■	ব	না	■	ন	■	র
দ	■	তি	র্য	ক	■	য	ব	নি	কা

না সার। আমার আবার মন্দ.....”

বাইরে কেউ হেঁড়েগলায় ডাকল, “হরি ! হরি ! অ্যাই হোরে !”

হরি বিরক্ত হয়ে বলল, “আমার মরারও সময় নেই। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এই হরি-হরি আর হোরে ! পরে বলব সার !”

বলে সে বেরিয়ে গেল। বললুম, “দেবতার ধন নিশ্চয় সেই ত্র্যম্বক। কিন্তু কর্নেল, পাঁচুঠাকুর যদি তা কাউকে বেচে দিয়ে থাকেন, তাঁর কাছে তা-ই দাবি করে তাঁর নাতিকে কিডন্যাপ করা হল কেন ? উড়োচিঠিটা তাঁকে উদ্দেশ করেই লেখা।”

কর্নেল কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, “একটা চিঠি নয়। দুটো।”

অবাক হয়ে বললুম, “কী করে বুঝলেন দুটো ?”

“হালদারমশাইয়ের নোটবইয়ে টোকা চিঠিটা দ্বিতীয় চিঠির কপি। কারণ ওতে ‘আবার বলা হচ্ছে’ এই কথাটা আছে।” কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন। “কিন্তু ঠাকুরমশাইকে দেখে মনে হল, কোনও উড়োচিঠি পাননি এবং নাতিকে গুম করে রাখা হয়েছে, তা-ও জানেন না। আমার অবাক লাগছে এটা।”

“সম্ভবত খুব ধূর্ত লোক। গভীর জলের মাছ।”

কর্নেল হাসলেন। “চিঠিতে ‘আদরের নাতি’ কথাটা আছে কিন্তু ! তা ছাড়া ত্র্যম্বক যে ওঁর কাছেই এখনও আছে, কিডন্যাপার যে বা যারাই হোক, তারা এতে নিঃসন্দেহ। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, রিকশওয়ালার কথা শুনে এবং এই নার্সারিতে আসার পর বুঝতে পেরেছি, বিশু কিডন্যাপড হওয়ার কথা এখানে এখনও জানাজানি হয়নি।”

“কর্নেল ! পাঁচুঠাকুর বলছিলেন, বিশু কেতোর বাড়ি যাচ্ছে বলে বেরিয়ে যায়। আর ফেরেনি। কে কেতো সেটা জেনে নেওয়া উচিত। তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।”

“তার আগে ছোটপুজো ডার্লিং !”

বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। পুবের বারান্দায় গিয়ে বসব ভেবে দরজার কাছে গেছি, হঠাৎ আলো নিভে গেল। কর্নেল বললেন, “চুপচাপ ঘরেই বসে থাকো জয়ন্ত। ঠাকরুনের প্রেতাত্মার আবির্ভাব যে-কোনও মুহূর্তে হতে পারে।”

ঘরে-বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস না থাকলেও এমন কথা শুনে গা ছমছম করা স্বাভাবিক। নিজেকে সাহস দিতে শুকনো হাসি হাসলুম। কিন্তু চেয়ার খুঁজতে গিয়ে শোবার খাটের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। কর্নেল টর্চ জ্বাললেন। হাসতে হাসতে বললেন, “সাবধান জয়ন্ত ! প্রেতাত্মা এসব চান্স মিস করে না।”

এইসময় বাইরে কে হেঁড়ে গলায় চেঁচাল, “হরি ! মুকুন্দকে বল জেনারেটর চালিয়ে দিক।”

হরি ডাকছিল, “মুকুন্দবাবু ! মুকুন্দবাবু।”

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। তারপর আবার চেঁচামেচি শোনা গেল। এবার অন্যরকম চিৎকার-চেঁচামেচি। তারপর বন্দুকের শব্দ। কর্নেল টর্চ জ্বেলে বেরোলেন। আমিও ওঁকে অনুসরণ করলুম। অন্ধকার নার্সারিতে এদিকে-ওদিকে টর্চের আলোর ঝলকানি এবং “চোর ! চোর ! চোর !” বিকট হাঁকডাক ছুটোছুটি চলেছে।

এতক্ষণে কাছাকাছি কোথাও জেনারেটর চালু হল। আলো জ্বলে উঠল। লনে আমাদের দেখে হরি হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, “চোর ঢুকেছিল সার ! একটা চটের থলে ফেলে পালিয়ে গেছে। কাঁটাতার কেটে পাঁচিল টপকে ঢুকেছিল। কী সাহস দেখুন !”

কর্নেল গম্ভীর মুখে শুধু বললেন, “চটের থলে ?...”

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : অনুপ রায়

ক্যাম্পাস

অনেক স্কুলের ছেলেমেয়েরা মিলে

ছেলেমেয়েরা কেবল পাঠ্য-বইয়ে মুখ গুঁজে দিন কাটাতে পারে না। তাদের জন্য দরকার স্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা, সঙ্ঘবদ্ধতা। সম্প্রতি এই ব্যাপারগুলিই ছাত্রছাত্রীদের কাছে সঠিকভাবে উপস্থিত করেছিল দীর্ঘ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘ'। পশ্চিমবঙ্গের জেলায়-জেলায় খেলাধুলো ও শক্তিচর্চা এই সঙ্ঘের মুখ্য কার্যক্রম হলেও, সাংস্কৃতিক ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহী করাও তাদের অন্যতম লক্ষ্য। যোগ-ব্যায়াম, খো-খো, ভারতীয়ম, হ্যান্ডবল, নেটবল, কবাডি, ভলিবল, ব্রতচারী ইত্যাদি খেলাধুলো ও শারীরচর্চার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের প্রাণ-বিকাশে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আবাসিক ও অনাবাসিক ভ্রমণ-শিবিরের মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের আনন্দদানের সঙ্গে-সঙ্গে পৌঁছে দিচ্ছে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা। হাওড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘ ৪ মার্চ হাওড়ার রামগোপাল মঞ্চে বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করল। হাওড়ার দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন, চ্যাটার্জিহাট বালিকা বিদ্যালয়, তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যাভবন, শিবপুর চ্যাটার্জিহাট বয়েজ স্কুল, ব্যাঁটরা মধুসূদন পালচৌধুরী বিদ্যালয়, মহাকালী বালিকা বিদ্যালয়, দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন, রামকৃষ্ণপুর বয়েজ হাই স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা হাওড়া জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক-উপসমিতির সম্পাদক উর্মিলা দাশগুপ্ত জানালেন, অগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে তাঁরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। পাঁচ থেকে পনেরো বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার

শিক্ষা-শিবিরে ছাত্রদের প্যারেড

মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দ্বৈত-রবীন্দ্রসঙ্গীত, আবৃত্তি-সহযোগে নৃত্য, কবিতা পড়ে ছবি আঁকা ইত্যাদি।

প্রতিযোগিতার বিভাগগুলিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী শান্তনু দেববক্সি, শান্তনু বাড়ুই, শাশ্বতী রায়, জয়ন্ত খাঁড়া, রামকৃষ্ণ বর্মন, অনিলেশ দে, শুচিস্মিতা পাঁজা, মণিদীপা বসু, শাশ্বতী রায়, সৌমী সামন্ত, মনোমিতা বসু, অনির্বাণ দাশগুপ্ত, সঙ্গীতা পাল, শুভ্রা চক্রবর্তী, মিতালি মুখোপাধ্যায়, রূপা দে, পারমিতা গঙ্গোপাধ্যায়, বিপাশা বসু, অনুপম কাঁড়ার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এদের পুরস্কৃত করা হয় বই ও শংসাপত্র দিয়ে। সঙ্ঘের সভাপতি অশোককুমার মল্লিক ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেন পুরস্কার। রূপা পাল, শুভ্রা চক্রবর্তী, শর্বরী দাশগুপ্তের উদ্বোধন-সঙ্গীত, রূপা পাল এবং সঞ্জয় দত্তের দ্বৈত আবৃত্তি ; সুস্মিতা মণ্ডল এবং শিপ্রা চক্রবর্তীর নৃত্য-পরিবেশন ; শুচিস্মিতা পাঁজা এবং সৌমী সামন্তর দ্বৈত-সঙ্গীত এবং সঙ্গীতা পাল-শুভ্রা চক্রবর্তীর আবৃত্তিসহ নৃত্য বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দ্বিতীয়ার্ধে আশিস মণ্ডলের নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' হয়ে উঠেছিল সব অর্থেই বিশিষ্ট প্রযোজনা।

"পেশাদার শিল্পী তৈরি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তেমন প্রযত্ন দেওয়ার সাধ্যই বা কোথায়! তবে, অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যেই যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে, তা একটু উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র।" বলছিলেন উর্মিলা দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানের পর ছেলেমেয়েরা একবাক্যে বলেছে, "এরকম অনুষ্ঠান আবার হলে আমরা আরও ভাল করার চেষ্টা করব।"

গৌতম ঘোষদস্তিদার

কলকাতার ইতিহাস

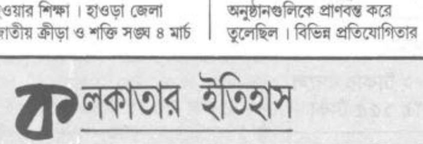

পুরনো কলকাতার স্মৃতি *ফোটো : রাসবিহারী দাস*

লা মার্টিনিয়ার ফর গার্লস-এর মাঠে ৯ মার্চ সন্ধেয় 'কলকাতার কথা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল লা মার্টিনিয়ার ফর গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আসনে বসবার পরই ত্রি-স্তর মঞ্চ জেগে উঠল মাঠের মাঝখানে। কলকাতার মিশ্র সংস্কৃতির প্রমাণ হিসেবে ছাত্রীরা ভাংড়া নাচের সঙ্গে অনুষ্ঠানের সূচনা করে। তারপর একের পর এক নাচ, গান, স্লাইড শো ও নাটিকার মাধ্যমে চোখের সামনে খুলে গেল কলকাতার ইতিহাস। ছাত্রীদের সহযোগিতা করেছিলেন শিক্ষিকারা এবং লা মার্টিনিয়ার ফর বয়েজ স্কুলের কিছু ছাত্র। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে ছিল ছাত্রীদের পেশাদারি দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষত কলকাতার আদি রূপ, জোব চার্নকের আদালত, ঘূর্ণি নাচের দৃশ্য, তরজা গান—দৃশ্যগুলি ছিল সুপরিকল্পিত ও উপভোগ্য। 'কলকাতার কথা' অনুষ্ঠানটি কলকাতার ইতিহাস নিয়ে হলেও এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রীরা মৈত্রী ও সাম্প্রদায়িক প্রীতির কথা তুলে ধরেছে।

সুদেষ্ণা রায়

এক বৎসর
২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর
৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক
বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৬ ডলার অথবা ২২ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

গল্প

অধীর বিশ্বাস

নাওভাঙা নদীতেও বুঝি শীত পড়ল। এই সময় সকালের মিষ্টি রোদ্দুর পোয়াতে যা আরাম না! এই নদীর পুঁটি মাছেদের খুব দুঃখ, ওই রোদ্দুর আগে এসে নদীর জলে পড়ে না। আগে পাবে মঠের চুড়ো। ওই রোদে মঠের পতাকা পতপত করে উড়ে যেন হেসে কুটিপাটি। তারপর যখন বেলা বাড়বে তখন আস্তে-আস্তে নদীর জলে আসবে। তা কেন হবে? এমন প্রশ্ন নাওভাঙা পুঁটিদের মনে কিছুদিন হল দেখা দিয়েছে। দেরি করে আসা রোদকে ওরা জলের উপর মুখ ভাসিয়ে বুড়বুড়ি কেটে জিজ্ঞেস করে। রোদ কথা শুনে মাথা নাড়ায়। বলে, "আমি কী করব বলো? আমার আর দোষ কতটা? নদীর তীরে যে বড়-বড় শিশুগাছ, তাকে চট করে ডিঙোয় কার সাধ্যি! আমি তো এক জায়গায় বসে আলো দিচ্ছি। পৃথিবী যেমনভাবে ঘুরবে তেমনভাবে সবাই আমার আলো পাবে। তোমাদের উপর তো কোনও রাগ নেই ভাই।"

রোদ যখন এসব কথা বুঝিয়ে-বুঝিয়ে বলছিল তখন সত্যি বলতে কি, পুঁটিদের তেমন রাগ ছিল না। রোদ আবার একটু তেজী হয়ে উঠল। অর্থাৎ, আর-একটু জোর হল রোদ্দুরের। সেই রোদে বাচ্চা-বাচ্চা সরলপুঁটি, তিতপুঁটি সব পেট ভাসিয়ে খেলা করছে। পুঁটিদের মোড়ল সরপুঁটি ওদের খুশি দেখে মজা পায়। বলে, "যতটা পারো আগে এসো। বাচ্চা-বাচ্চা মাছ তো, শীতের দিনে তোমাকে দেখলে আনন্দ পায়।"

"ঠিক আছে।" রোদ্দুর বলল, "যতটা পারি চেষ্টা করব।" এই বলে ঝাঁ করে নদীর জলে খ্যাপলা-জাল ফেলার মতন সুয্যিমামার রোদ ছড়িয়ে পড়ল।

এপার-বাংলা ওপার-বাংলায় কত রকমের নদী আছে। নাওভাঙা তেমনই একটি নদীর নাম। এই নদীর জলে একসময় এত স্রোত ছিল যে, নাও অর্থাৎ নৌকো স্রোতের পাকে নাকি ভেঙে যেত। সেইজন্য লোকের মুখে-মুখে এই নদীর নাম হয়েছে নাওভাঙা। তেমন স্রোত বইত সে অনেক আগে। এখন এই নদী হেজে-মজে গেছে। ভারত—পাকিস্তান হবার পর নদীর আর সংস্কার হয়নি। জল শুকিয়ে মাটি জেগে

উঠেছে। এখন এই নাওভাঙার মাঝখান দিয়ে লোকে ধানচাষ করে। পাট হয়। সর্ষে বোনে। বর্ষাকালে জল হয়ে আবার নদী-নদী লাগে। তবে স্রোত থাকে না। ডিঙি-নৌকো ঘোরাঘুরি করে। বৃষ্টির জল বেয়ে অনেক মাছ জমা হয়। আবার বড়পুজোর পর শীত পড়তেই জল শুকোতে থাকে। তার ভিতরই কিছু জল থেকে যায়। নাওভাঙার সব মাছ এক হয়ে ওইসব গর্তের জলে বাসা বাঁধে। পুঁটি, ট্যাংরা, মাগুর, কই। পুঁটিমাছই বেশি। সরলপুঁটি, তিতপুঁটি। তাদের মধ্যে অল্প কিছু সরপুঁটি। সকালের রোদের জন্য পুঁটিরাই বেশি ছটফট করে।

রোদের সঙ্গে অনেক কথা খরচ করে বড্ড খিদে পেয়েছে সরপুঁটির। পাখনা মেলে যেই একটু এগিয়েছে অমনি দ্যাখে একটা ল্যাঠামাছ রাঙাপুঁটিকে তাড়া করেছে। রাঙাপুঁটি ফুড়ুত-ফুড়ুত করে এদিক-ওদিক ডালপালার ভিতর দিয়ে তার পাশ দিয়ে যেতেই সরপুঁটি জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে রে ?"

রাঙাপুঁটি ভয়ে গুটিসুটি হয়ে সরপুঁটির একেবারে কানকোর তলায় গিয়ে আশ্রয় নিল। রাঙাপুঁটিকে দেখতে বেশ। ওদের গায়ে রামধনু রঙের দাগ-কাটা। টুকটুকে। মনে হয় কাছে নিয়ে আদর করে। এই জাতের পুঁটি খুব একটা দেখা যায় না। কোথা থেকে যে এল ? সরপুঁটি ওকে আগলে মজা পাবার গলায় জিজ্ঞেস করে, "কে তাড়া করেছে, রাঙা ?"

"ওই যে ওই দুষ্টু ল্যাঠাটা।"

একটু দূরে ল্যাঠা তার লম্বা-লম্বা সুচের মতো দাঁত মেলে চেয়ে আছে। সরপুঁটির কোল থেকে বেরোলেই বুঝি খেয়ে ফেলবে। সরপুঁটি সেদিকে তাকিয়ে বলল, "বুঝেছি।" তারপর জল কেটে-কেটে এগিয়ে যায় ল্যাঠার দিকে। রাঙাপুঁটি কিন্তু তখনও সরপুঁটির পেটের তলায়। কাছে গিয়ে জানতে চায় সরপুঁটি, "কী ল্যাঠাভাই, অমন তাড়া করছিলে কেন ?"

ল্যাঠামাছের শরীর-স্বাস্থ্যও কম যায় না। ছাইকাদা গায়ের রং। চোখ আর মুখের হাঁ দেখলে অনেক মাছই ভয় পাবে। তবু ল্যাঠা ডোবার মোড়ল সরপুঁটিকে কোনও অসম্মান করল না। বলল, "বৃত্তান্ত সব জানতে চাও ?" এই বলে একটু জিরিয়ে নিল। বলে, "আমি সড়াগাছের পচা-খোসা খাচ্ছিলাম। আর পাজি পুঁটি কী করছিল জানো সরপুঁটিভাই ?"

"কী ! কী করছিল বলো। অন্যায় করলে ওকে বকে দেব।"

"জলে যখন সড়াগাছের ডাল পড়েছে, তা সবাই খাও। খেতে তো কারও মানা নেই। আমি খাচ্ছিলাম। কিন্তু ওই ছোকরা-পুঁটি আমার গায়ে যে লালা-জড়ানো শ্যাওলা থাকে, তাই খুঁটে-খুঁটে মহা আরামে খাচ্ছিল। ভাবি, গায়ে সুড়সুড়ি লাগে কেন ? তারপর তাকিয়ে দেখি এই ছিরিমান। কী সাহস, ভেবে পাই না ! ধরতে পারি একবার !"

"না, না। ল্যাঠাভাই তুমি কেন শাসন করবে ? ওকে নিষেধ করো। না-শুনলে আমাকে বলো। তারপর উচিত শিক্ষা দেব আমি।"

"বেশ। তোমার কথা মানছি আমি। কিন্তু ওইটুকুন এক বাচ্চার মজার পাত্র আমি ? ধরো, তোমার গায়ে কোনও ছোট মাছ যদি অমন করে, বলো রাগ হবে না ?"

সরপুঁটি মুখ টিপে হাসে। বলে, "তা একটু হবে বইকী ! যাক, এবারের মতন ওকে কিছু বোলো না। পরে যদি এমন করে তবে আমি ব্যবস্থা নেব।" এই কথা বলে সরপুঁটি পেট বাঁকিয়ে রাঙাপুঁটিকে উপদেশ দেয়, "যা, ল্যাঠাবাবুকে গিয়ে বল, আর এমন করব না।"

তখনও রাঙাপুঁটির ভয় কাটেনি। একটু-এগিয়ে থমকে গেল। এক জায়গায় ভেসে থাকলেও ওর পাখনা আর লেজ নড়ছে। সরপুঁটি ব্যাপারটা বুঝে-সুঝে বলল, "যা। ভয় নেই। চল, আমিই সঙ্গে যাচ্ছি।" এই বলে রাঙাপুঁটির বাচ্চাকে ল্যাঠামাছের একদম কাছে নিয়ে গেল। আর যেতেই ল্যাঠা ওর লেজ নাচিয়ে সরে গেল। "থাক। থাক। এখন আমার কোনও রাগ নেই।"

সবই তো হল। রোদ্দুর আসছিল না, রোদ এল। ল্যাঠামাছের রাগ পড়ল। রাঙাপুঁটি বেঁচে গেল। এবার সরপুঁটির খাবার জন্য আর কোনও বাধা নেই। তাই সে ধীরেসুস্থে পিঠ ভাসিয়ে সড়াগাছের মিষ্টি ডালে সবে মুখ দিয়েছে অমনি বাবলাগাছের ডালে বসে চিলটা চিৎকার করে ডেকে উঠল। চিলের গলা কাঁপতে লাগল। চোখ দুটো ঘুরতে লাগল। ওর অস্থিরতায় বাবলাগাছের ডালটাও দুলতে লাগল। চিঁইই-চিঁইই ডাক শুনে নাওভাঙার বুড়ো মাছরাঙা উড়ে এল। এই ডাকের মানে খুব সহজ। এই ডাকের মানে ডোবায় মাছ জেগেছে। অনেক মাছ। বুড়ো মাছরাঙা চুপিচুপি গাছপালার ভিতর দিয়ে এমনভাবে গাঙকূলের বাঁশের কঞ্চিতে এসে বসল যাতে চিল মনে করতে না-পারে তার ডাকেই লোভী মাছরাঙা হাজির হয়েছে। বেঁটে লেজের এই মাছরাঙা যখন কোনও ডালে বসে তখন ওর শরীরটা কোনাকুনি আর খাড়া হয়ে থাকে। ঠোঁট দুটো চিমটের মতো

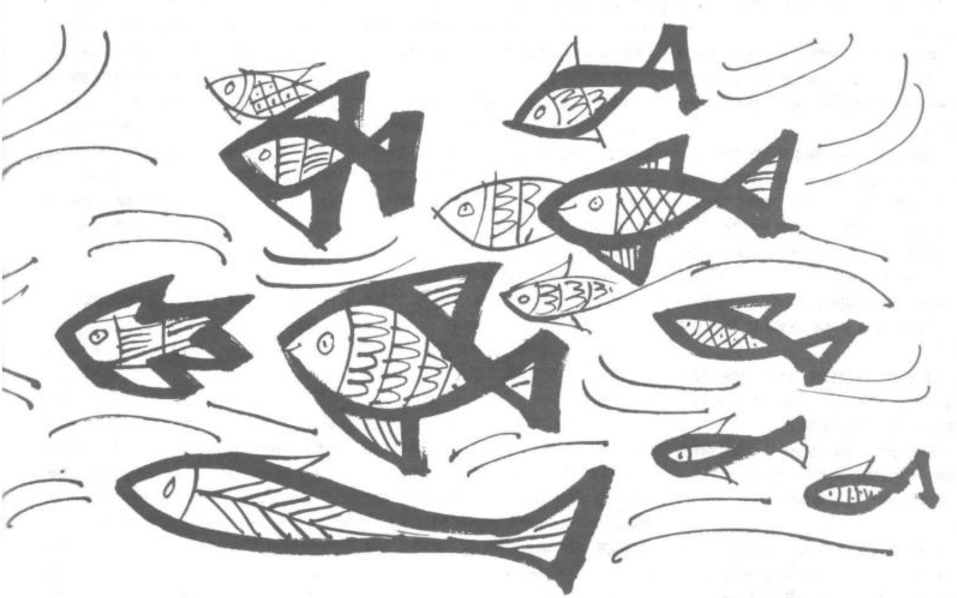

লম্বা ও বাঁকানো। ঝপাত করে জলে পড়লে মাছরাঙা মাছ পাবে না তা কিন্তু বিশ্বাসই হয় না। শব্দ উঠবে ঝপাত আর কিরিক-কিরিক। তা হলেই বুঝতে হবে ধরেছে একটা। এমন পাখিও নাওভাঙার এই ডোবার কাছে হাজির।

এই নদীর উত্তর-পুব দিকে অনেকদিন হল একটা তালের ডোঙা কাদার ভেতরে গেঁথে আছে। ঘাস-জঙ্গলের মধ্যে অল্প-অল্প জল। সেই জল দিয়ে খুব সন্তর্পণে, পা টিপে-টিপে এক মেছোবক ঘোরাঘুরি করছিল। সেও শুনল চিলের ডাক। মেছোবক ওর কাঠির মতন সরু-সরু পায়ের উপর ভর দিয়ে ঘাড়টা একটু বেঁটে করে বুঝে নিতে চাইল চিলের ডাকটা কেমন ধরনের। মাছের ডাক, না বিপদের! সেই ডাক! আবার সেই চিঁইই ডাক শুনল, অমনি বুঝে ফেলল ডাকের অর্থ। বক এবার পা দুটো ভাঁজ করেই পাখনা মেলে না উড়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। এপার-ওপার লোহার ব্রিজ। তার উপর দিয়ে গাড়ি গেলে গুড়গুড় আওয়াজ হয়। সেই আওয়াজ আসছে এখন। মেছোবকের এসবে অভ্যাস আছে। সে এসব টপকে সেই সড়াগাছ-ফেলা ডোবার সামনে হাজির। হাজির হতেই তাকে দেখে ফেলল চিল। আর দেখল মাছরাঙা। আর বককে দেখতে গিয়ে তিনজনের সঙ্গেই চোখাচোখি।

এবারের বর্ষায় ভাল বৃষ্টি হয়নি। যা একটুকুন হয়েছে তাতেই নাওভাঙা নদীর মাঝে-মাঝে জল জমে আছে। তবে রেলব্রিজ থেকে মঠ পর্যন্ত একটা ডোবাতেই জল। তাও আবার কোন লোকটা যে সড়াগাছ দিয়ে গেছে! এই গাছের ডাল জলে দিলে চিল, মাছরাঙা কিংবা বকেরা একদম সুবিধে করতে পারে না। ওই গাছের পচা ছাল মাছের খুব প্রিয় খাবার। বড়ও হয় তাড়াতাড়ি। এখানকার মাছগুলো তাই খেয়ে-পরে বেশ আনন্দেই আছে। ডোবার মোড়ল নাদুসনুদুস ওই সরপুঁটিকে দেখতে পেয়ে চিলের জিভে জল এসে গেল। তখনই সে চিৎকার করে ডেকে উঠল। কেননা, সে জানে ওই মাছ ধরা অসম্ভব। তাক করলেই ডালের আড়ালে চলে যাবে। চলে যাবে জলের তলায়। তবু মন কি আর মানে? তাই অমন করে ডাকটা দিল। তবে সেই ডাকের ধরন কিন্তু মাছ দেখতে পেয়ে ডাকার মতন। সেই ডাক শুনে মাছরাঙা আর বক ছুটে এসেছে।

তা ছুটে যখন এসেইছে আর চোখাচোখিই যখন হল তখন ওরা তিনজনই খুব কাছাকাছি এসে গেল। চিল বলল, "এসে কোনও লাভ নেই ভাইসব। অবশ্য আসার জন্য দোষ দিইনে তোমাদের, জেনে রাখো, হয় সড়াগাছের ডাল সরাবার ব্যবস্থা করো, নয়তো জল শুকনোর। এ দুটোর একটা না-করতে পারলে কোনও লাভ হবে না।" চিলের শরীর হৃষ্টপুষ্ট। কথা বলতে বলতে গাছের ডালটা নড়ছিল। বলল, "এমনভাবে ডাক দিলাম যাতে নাওভাঙার মাছপ্রিয় প্রাণীরা কাছে আসে। এসেছ যখন, তোমাদের কাছে বলে দিলাম আসল কথাটা। দ্যাখো, উপায় বার করতে পারো কি না!"

চিলের কথা শুনে খয়েরি পালকের মেছোবক মাথা দোলায়। ঠিক, ঠিক। মাছরাঙাও কিরিক-কিরিক ডাকে জানিয়ে দিল তার সমর্থনের কথা।

"তা হলে উপায়?" চিল আবার জানতে চায়।"

"উপায় একটা আছে।"

"কী, কী?"

মেছোবক তার ইচ্ছের কথাটা জানাতে গিয়ে এদিক-ওদিক চাইল। না, এই তিন প্রাণী ছাড়া নাওভাঙার ধারেকাছে কাউকে চোখে পড়ছে না। বলল, "সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রোজকার মতন একটু হাঁটাচলা করছিলাম। তখনই একটা কথা শুনেছি।"

"কী, কী ?" চিল আর মাছরাঙা বুঝি নাছোড়বান্দা।

মেছোবক ফ্যাসফেসে গলায় কককক শব্দ করে বলতে লাগল, "ডোবার মোড়ল সরপুঁটি রোদ্দুরকে তাড়াতাড়ি রোদ দেবার কথা বলছিল।"

মাছরাঙা বাকিটুকু আর বলতে দিল না। না-দিয়ে খুশিতে ফুড়ুত করে একটু উড়ে আবার সেই গাছে এসে বসে বলল, "মতলব এখন নাগালের মধ্যে। আমরা দল বেঁধে গিয়ে রোদ্দুরকে বলব, একদিন বেজায় রকমের খরা দাও, তাপ দাও। সবাই মিলে বললে সেও আমাদের কথা শুনবে। তারপর জল শুকিয়ে গেলে যতই ডাল থাকুক, তখন যা মজা হবে না!"

এই কথায় মেছোবক হেসে ফেলে, "হ্যাঁ, মাছরাঙা-ভাইয়ের বুদ্ধি আছে। আমিও এমন একটা কথাই ভাবছিলাম।"

"তা হলে এক্ষুনি চলো।" চিল বলল, "সারা নাওভাঙা জুড়ে রোদ্দুর রয়েছে। যেখানেই হোক, এক জায়গা থেকে বললেই হল।"

এদের ইচ্ছের কথা শুনে রোদ্দুরের বুঝি উভয়সঙ্কট। অনেক ভেবেচিন্তে শেষে বলল, "এত বড় একটা ব্যাপার চট করে বলা যাবে না। একদিন সময় দাও। কালকে এমন সময় এসো, তখন না হয় বলা যাবে।" এই বলে রোদ্দুর তার তেজ কমিয়ে আস্তে-আস্তে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগল। কেননা, কথা বলাবলি করতে করতে এখন প্রায় বিকেল।

এই একটা রাত্তিরে কারও ঠিকমতো ঘুম এল না। বক তার বাসায় গিয়ে ছটফট করতে লাগল। মাছরাঙা মাঝরাত্তিরে উঠে একবার জ্যোৎস্নার আলোয় উড়ে এল। চিল আর কী করে! জেগে থাকার চেষ্টা করতে করতে সেও মাদার গাছের বাসায় বসে ঘুমচোখে ঢুলতে লাগল।

সকাল হতে-না-হতেই আবার ওরা তিনজনেই তিনজনকে দেখে ফেলল। মাছরাঙা ওদের থেকে দেখতে ছোট। উৎসাহ কিন্তু তারই বেশি। বলে, "কী যে হবে আজ! কী খবর নিয়ে আসছে রোদভাই, কে জানে তা!"

রোদ্দুর কিন্তু নিয়মমতোই নাওভাঙায় এল। রোজকার মতন প্রথমে মঠের চুড়ো, তারপর ধীরে-ধীরে রোদ ছড়িয়ে পড়ল নাওভাঙা নদীর বুক-বরাবর। রোদকে আসতে দেখে ডোবার মোড়ল সরপুঁটি জলে একটা ঘাই দিয়ে বলল, "সুপ্রভাত রোদভাই, সুপ্রভাত।"

রোদ্দুর শব্দ করে উত্তর না দিয়ে একটা হাসি-হাসি মুখ করে ঘাড়টা কাত করল।

আজও তার একই তেজ, একই আলো। রোদ্দুরের কথামতন চিল, মাছরাঙা আর বকের দেখা করার কথা বিকেল হবার আগে। কিন্তু সে তর আর সইল না ওদের। চিল বলল, "অন্যায় নেবেন না। আমরা একটু আগেই এসে পড়লাম।"

"না ভাই। অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম। আমি বেনিয়ম কিছু করতে পারি না। এক জায়গায় থাকি আমি। তোমাদের পৃথিবী যেমন ঘুরবে তেমন-তেমন আলো পাবে তোমরা। যেদিন আমাকে দেখতে পাও না, জানবে, আকাশে মেঘ ছিল। ওই জন্যই তোমরা কম-বেশি আলো পাও।" রোদ্দুর বলে যায়, "আরও কারণ আছে। সেসব একদিনে হবে না। অনেক কথা। তবে জেনে রাখো, সবাই সমান আমার কাছে। ডোবার মাছ, নদীর মাছ, তোমরা পাখিরা—সবাই। কারও জন্য আলাদা কিছু করা মানে অন্যকে ঠকানো। সেটা আমি চাই না। মন খারাপ কোরো না। শুভ সংবাদ নিশ্চয় পাবে!" মুখের কথা মুখে থাকতেই আকাশ গুড়গুড় করে উঠল। রোদ্দুর বলল, "ওই শোনো। মেঘ করছে। আকাশ ডেকে উঠল। আমাকে আর দেখতে পেলে না। আমি চললাম। আবার দেখা হবে।"

সে কী বৃষ্টি! নামছে তো নামছেই। দু'দিন হয়ে গেল বৃষ্টির বুঝি বিরাম নেই। হরিদাসপুর আর ওপারে খলিতপুরের গ্রাম বেয়ে—বেয়ে জল নামছে নাওভাঙা নদীতে। বৃষ্টি পেয়ে মাছপ্রিয় তিন পাখি—চিল, মাছরাঙা আর বক, কোথায় যে আছে এখন কেউ বলতে পারবে না। কলকল জলের সঙ্গে কতরকমের মাছ! নাওভাঙায় জল জমে-জমে যেন বর্ষাকালের রূপ নিচ্ছে। যে যেখানেই থাক মাছরাঙা তার তালের ডোঙা সোজাসুজি আঘাটায় দাঁড়িয়ে জলে ঠোঁট নামাতেই বুঝি পুঁটি, মৌরলা মুখে গিয়ে ঢুকছে। চিল বড় একটা মাছ নিয়ে দিন কাটিয়ে দিল। ঝপাত-ঝপাত জলে ডুব দিতে-দিতে মাছরাঙার শরীর ব্যথা হবার জোগাড়। মেঘের আড়ালে থেকে রোদ্দুর কিন্তু সবই দেখছে। বৃষ্টিটা একটু ধরুক। তারপর ওদের ডেকে শুধু বলবে, "কী, বলেছিলাম না, দুঃখ কোরো না! এখন খুশি তো?"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবির আভাস লুকিয়ে আছে

ত্রিভুজ এবং বৃত্ত ছড়িয়ে আছে আমাদের আঁকার পাতায়। এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে ছবি। তোমরা কল্পনায় ধরার চেষ্টা করো তো কোন ছবির আভাস লুকিয়ে আছে আঁকার পাতায়!

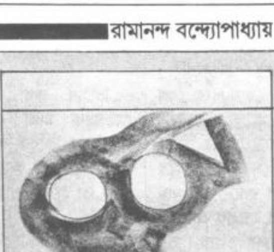

হাসিখুশি — শতদল

একটি ছোট মেয়েকে কাঁদতে দেখে প্রতিবেশী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আমি হলে কিন্তু তোমার মতো কাঁদতাম না।" মেয়েটি বলল, "জানি, তুমি হলে তোমার মতো করে কাঁদতে, আমার কান্না এইরকমই।"

দিদিমণি : বুবুন, ধরো তোমার বাবা তোমাকে সাত টাকা দিলেন আর তোমার মা দিলেন ছ' টাকা, এ ছাড়া কাকা দিলেন আরও চার টাকা। এখন বলো তো, সব মিলিয়ে তোমার কত টাকা হল? বুবুন কোনও উত্তর দিতে পারল না দেখে দিদিমণি বললেন : এত

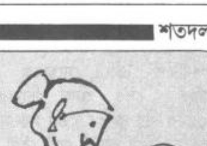

সহজ হিসেবটা, করতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

বুবুন : আসলে আমি প্রথমেই ভেবে নিচ্ছিলাম টাকাগুলো দিয়ে চকোলেট খাব, না আইসক্রিম কিনব।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

!!!!!
তোমাকে কচুকাটা করব, শার্লক হোম্‌স !
দাঁড়াও, অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবার মজা টের পাওয়াচ্ছি ! তোমাকে ঝাঁজরা করে দেব !
তোমাকে কিমা বানাব !
তা-ই করবে মনে হচ্ছে !
বাঁচাও !
মরেছে ! এবার সত্যিই বিপদে পড়লাম দেখছি !
দুম
যাচ্চলে ! কী হচ্ছে ! কুট্টুস, তুমি লুকিয়ে পড়ে ভাল করেছ !
কুঁইইইই ! কুঁইইইই !
?
কুঁইইইই !
আহা রে ! বেচারা কুট্টুস !
ঘাবড়াস না ! তেমন কিছু হয়নি ! এক্ষুনি সব ঠিক হয়ে যাবে ! ভেবে দ্যাখ, তোর লেজটা কেটে দু'টুকরো হয়ে যেতে পারত ! তার চেয়ে এটা ভাল নয় ?
তোমার আর কী ! লেজটা আমার আর আমার মতে এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! আমার চেহারা বিচ্ছিরি করে দিয়েছে !
গ্রাইন্ডি কর্পোরেশন
গোটা দলটাই বন্দী । এবার নিশ্চিন্তে একটু বিশ্রাম নিতে পারি !
নিখোঁজ কালো বেড়াল পুরস্কার
নিখোঁজ পুড়ল পপ্‌সি পুরস্কার
নিখোঁজ শেফার্ড কুকুর
নিখোঁজ সাদা তুর্কি বেড়াল পুরস্কার

আমেরিকায় টিনটিন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাটম্যান
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বাওয়ার স্টিলের বিরুদ্ধে এমন প্রমাণ সাজিয়েছিল যাতে স্টিলকেই খুনি বলে সন্দেহ হয়। ব্যাটম্যান আর রবিন সেই সত্য উদ্ঘাটন করে প্রকৃত অপরাধীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল...
হকিন্স কোথায় ? সেই ছুঁচোটা ?
এটা আমার !
আমার বিরুদ্ধে সাজানো প্রমাণের শাস্তি !
বন্দুক ফেলে দাও, নইলে এই দুটো মরবে !
তা হলে এরাই আমাকে খুনি সাজাবার চক্রান্ত করেছে ! নিশ্চয় হকিন্স এদের বস !
না ! আর আধ ঘণ্টা বাদে ডোরিয়ানকে খুন করার জন্য ওদের বসের মৃত্যু হবে !
সেই বস আর কেউ নয়, মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচাতে আমাকে যে অনুনয় করেছিল, সেই বাওয়ার স্বয়ং !
বাওয়ার বই-এর সিন্দুক খোলার সঙ্কেত জানত। রাত্তিরে ও দোকান থেকে বই নিয়ে এসে এখানে সেগুলি জাল করে আবার সিন্দুকে রেখে আসত। কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারত না !
কিন্তু তোমরা ভুল করেছিলে, তাই না ?
হ্যাঁ। ডোরিয়ান সন্দেহ করতে শুরু করে। ও দোকানে ওত পেতে বসে ছিল। ধস্তাধস্তির সময় ডোরিয়ানের পিস্তল কেড়ে নিয়ে বাওয়ার গুলি করে, আমি পালাই। বাওয়ারকে পুলিশ ধরে ফেলে !
মৃত্যুদণ্ড হলে বাওয়ার বেপরোয়া হয়ে আমাদের খবর পাঠায়, ওর কথামতো কাজ না করলে ও আমাদের জড়াবে !
তাই ওরা বাওয়ারের তৈরি ছকে তোমাকে ঝুলিয়ে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে !
বাওয়ারের সাজানো নাটকে প্রায় ভুলেছিলাম। ও দারুণ নাট্যকার হতে পারত !
আর-এক নাট্যকার, শেকসপিয়র বলেছেন, "জিভ না থাকলেও হত্যা অলৌকিকভাবে কথা বলবে।"
এবং এক গ্রিক নাট্যকার বলেছেন...
"অপরাধ ঢেকে রাখা যায় না।"

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ধারাবাহিক উপন্যাস

সোনার গণপতি হিরের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

কাকিমা চিৎকার করে বললেন, "তুমি যাওনি ?" শুভঙ্কর বলল, "দাঁড়াবার সময় নেই। আপনি সব কথা কাকাবাবুর মুখে শুনবেন। এখন আমরা চলি। আজ রাতে আমরা কেউ ফিরব না।"

ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। সঙ্গে-সঙ্গে চলে গেল।

যাওয়ার আগে মউ বলল, "আমাকে একবার বাড়ি যেতে হবে শুভঙ্কর। না হলে মা ভীষণ চিন্তা করবে। তা ছাড়া এই ডায়েরিটা গুছিয়ে রেখে একটা টর্চ আর কিছু টাকা পয়সাও সঙ্গে নিতে হবে।"

শুভঙ্কর বলল, "টাকা আমার কাছে আছে।"

"কত আছে ? চার-পাঁচশোর বেশি নিশ্চয়ই নেই ?"

"ওর চেয়েও অনেক কম টাকা আছে।"

"তবে ? আমিও কিছুটা সঙ্গে রাখি। বলা যায় না, কখন কী দরকারে লাগে।" বলে শুভঙ্করকে ওদের বাড়ির সামনে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে মউ ঘরে গেল ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। মাত্র দু-পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। তারপরই একটা টর্চ হাতে এগিয়ে এসে বলল, "চলো।"

চলো তো চলো। কিন্তু কোন দিকে ?

শুভঙ্কর বলল, "আমরা কীভাবে এবং কোনদিকে যাব ?"

"আপাতত আমরা বম্বে রোডের দিকে যাই। যদি কোনও ট্রাক ম্যানেজ করতে পারি তা হলে খুবই ভাল হয়। এ ছাড়া কোনও পরিবহণ তো আমরা পাব না। সন্ধের পরই এখানে সব কিছুই নিঝুম হয়ে যায়। বহরাগোড়ার শেষ বাসও চলে গেছে। না হলে বাসেও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু এখন একমাত্র ট্রাক ম্যানেজ করা ছাড়া কোনও ভরসাই নেই।"

শুভঙ্কর বলল, "রাতের কোনও গাড়ি নেই ? কোনও প্যাসেঞ্জার ট্রেন ? তা হলে আর অত বিপদের ঝুঁকি নিতে হত না।"

মউ বলল, "না, তাও নেই। ডাউন গুয়া খড়্গপুর প্যাসেঞ্জারটাও বেরিয়ে গেছে একটু আগে। এখন রাত দুটোর আগে কোনও গাড়িই নেই। তাও দুটোর যে গাড়ি তার আবার স্টপ নেই গিধনিতে। আমাদের হয় চাকুলিয়া নয় ঝাড়গ্রামে নামতে হবে। এ ছাড়া কোনও উপায়ই নেই।"

ওরা দু'জনে দ্রুত হেঁটে বম্বে রোডে এসে পৌঁছল।

চারদিকের অন্ধকার ভেদ করে একটু-একটু করে জ্যোৎস্নার আলো ফুটছে তখন।

ঝড়ের বেগে একটা ট্রাক হেডলাইট জ্বেলে ছুটে আসছে ওদের দিকে। ওরা হাত দেখাল। কিন্তু না, পাঞ্জাবি ড্রাইভার আড়চোখে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে আরও জোরে চালিয়ে গেল গাড়িটা। এইভাবে একটির পর একটি ট্রাক অতিক্রম করে গেল

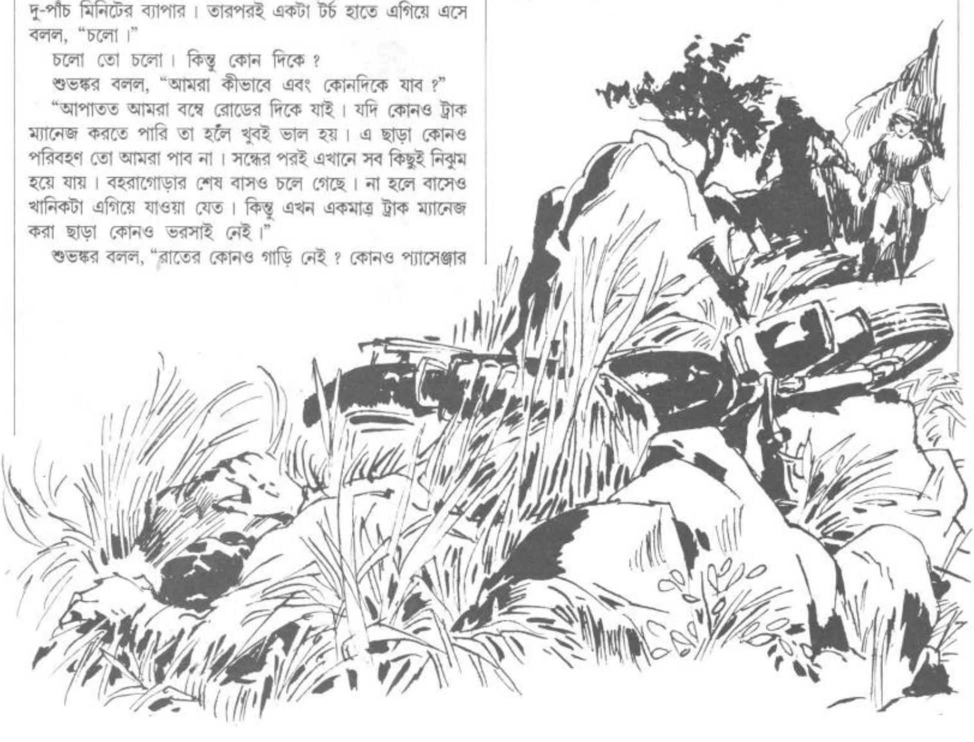

ওদের। কিন্তু ওরা হাজার চেষ্টা করেও একটা ট্রাককেও থামাতে পারল না। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বৃথা চেষ্টা করার পর ওরা আশাহত হয়ে স্টেশনের দিকে এগোতে লাগল। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে শালবনের ভেতর দিয়ে লাইন ধরে স্টেশনের পথ।

বনের পথ অন্ধকার। তাই টর্চের আলোয় পথ দেখে এগোতে লাগল ওরা। শুভঙ্কর ও মউ অবাক বিস্ময়ে দেখল, এক জায়গায় ঝোপের ধারে লাল রঙের একটি মোটরবাইক রাখা আছে। আর ঠিক তার কাছাকাছি হুমড়ি খেয়ে মাটির ওপর পড়ে আছে কে যেন একজন। কে, কে ও?

ওরা দু'জনেই ছুটে গেল সেইদিকে। গিয়ে দেখল গুলিবিদ্ধ একজন লোক অন্তিম শয়নে লুটিয়ে আছে মাটির বুকে। ওর এক হাতে জঙ্গলের মেথিঘাস মুঠো করে ধরা। অন্য হাত আঁকড়ে আছে শক্ত একটি পাথর। আসলে মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মানুষ যা-কিছু হাতের সামনে পায় তাই ধরেই আবার বেঁচে উঠতে চায়।

মউ বলল, "এ তো সেই লোক।"

"হ্যাঁ, ভচু। মুখ না দেখতে পেলেও চিনতে পেরেছি ওকে। যে তোমাকে ছাদের ওপর আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। কড়ির সর্পাঘাতে মৃত্যুর পর সোনার গণপতি নিয়ে যে একাই পালিয়ে যাওয়ার মতো দুর্বুদ্ধি মাথায় এনে ভুল করেছিল।"

মউ বলল, "দুর্বুদ্ধি কেন?"

"ওই অভিশপ্ত গণপতিকে নিয়ে কোনওরকমেই চালাকি করা যায় না। এই সত্যটা ও জানত না অথবা জেনেও অবজ্ঞা করেছিল।"

"সোনার গণপতি তা হলে কোথায়?"

"আপাতত শিকারি বাজের হাতে। সে এত বোকা নয় যে, এই মূর্তি উদ্ধারের দায়িত্ব এদের দু'জনের হাতে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে। কার্যোদ্ধারের পর ওর পালিয়ে যাওয়ার মতলব টের পেয়েই ওকে গুলি করেছে। অথবা দলের লোককে ফাঁকি দেবে বলে এটাই তার পরিকল্পনা।"

ওরা দু'জনে ভচুকে পরীক্ষা করে দেখল সত্যাই সে মৃত। তারপর পকেট হাতড়ে কোনও কিছুই না পেয়ে কী যে করবে সেই ব্যাপারেই চিন্তা করতে লাগল।

মউ বলল, "শিকারি বাজের হাতে সোনার গণপতি যদি সত্যিই পড়ে থাকে তা হলে বিল্টুদাকে বাঁচানো আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে হত্যা করে বিজয় উল্লাসে কনকদুর্গার মন্দিরের সামনে নির্জন অরণ্যে পৈশাচিক নৃত্য করবে ও। এই রাতই বিল্টুদার জীবনের শেষ রাত। আর সেই সঙ্গে হয়তো তিন্নিরও। তিন্নিকে নিয়ে ওরা কী যে করবে তা কে জানে?"

"তা হলে এখন উপায়?"

"তবু দেখতে হবে।"

"কিন্তু কীভাবে?"

"ওই বাইকটা নিয়েই যাব।"

"তুমি একা যাবে?"

"একা কেন? তুমিও যাবে।"

"তুমি তো ডবল ক্যারি করতে পারো না?"

"আসলে করিনি কোনওদিন। তবে আজ একটু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?"

"জয় বাবা গণেশ। আমার কিন্তু ভয় করছে খুব।"

"ভয় কী! কাল অমন দুর্ঘটনার পরও আমি তো আবার সাহসে ভর করে সেই বাইকেই চাপছি। তবে এখন তো আর উঁচু-নিচু পথ বা খানাখন্দ পাব না। এখন পিচঢালা মসৃণ পথ ধরে আমরা যাব। তুমি খুব শক্ত করে ধরে থাকবে আমাকে। আমি অবশ্য আস্তেই চালাব। না হলে দু'জনেই মরব একসঙ্গে।"

ওরা সেই মোটরবাইকটাকে টেনে পথে নামাল। তারপর জঙ্গলের পথে না চালিয়ে ওটাকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল বম্বে রোডে।

মউয়ের দক্ষতা দেখে অবাক হয়ে গেল শুভঙ্কর। ওর চেয়ে তো এক বছরের ছোট ও। অথচ কী দারুণ স্মার্ট। সাহসী। গ্রামের মেয়ে। বাস করে শহুরে পরিবেশ থেকে অনেক দূরে। তবু কী দুরন্ত দুর্বার।

মোটরবাইকে চেপে বসে স্টার্ট দিয়ে শুভঙ্করকে বলল মউ, "নাও, বসে পড়ো। যদি ভয় করে চোখ বুজে থেকো। কোনও রকমে গিধনি পর্যন্ত যদি যেতে পারি তা হলে চিলকিগড় পৌঁছতে দেরি হবে না। এখন দেখি ঠাকুরের কী ইচ্ছে।"

জ্যোৎস্না-মাখা অন্ধকারে মউয়ের মোটর বাইক ভটভটিয়ে এগিয়ে চলল। প্রথমে দু-একবার টলমল করলেও ফাঁকা এবং সরল রাস্তায় বেশ খানিকক্ষণ যাওয়ার পরই আয়ত্তে এসে গেল সব। বাইকটা যখন একটু-একটু করে জোরে স্পিড নিতে লাগল, সেই সময়ই বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেল বাইকটা।

কী হল ? তেল-টেল নেই নাকি ? হয়তো তাই। তা হলে উপায় ?

জায়গাটা শহর থেকে দূরে নির্জনে। কাছেপিঠে কোথাও কোনও লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। দু'পাশে মাঠ আর জঙ্গল। জঙ্গল অবশ্য ঘন নয়। রাতের আবছায়ায় দেখলে ভয় করে। দূরের পাহাড়গুলোকেও আর দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ পার্বত্য পটভূমিকার বাইরে চলে এসেছে ওরা।

শুভঙ্কর বলল, "এ কোথায় এলাম আমরা ?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি, গিধনি এখনও অনেকদূর।"

"তা হলে উপায় ?"

"উপায় একটা হবেই। এখন এর মায়া ত্যাগ করে পায়ে হেঁটেই যতটা পারি এগিয়ে যাই চলো।"

"এই নির্জনে এত রাতে আমাদের হেঁটে যাওয়াটা কি ঠিক হবে ?"

"আঃ, চলোই না। থেমে থাকার সময় নেই আর। যেতে-যেতে আবার চেষ্টা করব কোনও যানবাহন দেখলে থামাতে।"

শুভঙ্কর বলল, "তাই চলো। তবে আমার মাথায় কিন্তু একটা অন্য বুদ্ধি এসেছে।"

"কীরকম শুনি ?"

"আমি বলি কি, আমরা দু'জনে এই রাতদুপুরে অযথা পথ হাঁটার ঝুঁকি না নিয়ে মোটর বাইকটাকে বরং রাস্তার মাঝখানে শুইয়ে রাখি।"

"তারপর ?"

"তারপর দ্যাখোই না মজাটা।"

"তুমি কী বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"এ আর না বোঝার কী আছে ? এটাকে রাস্তার মাঝখানে ফেলে রাখলে হবে কি, এই পথে কোনও গাড়ি এসে পড়লে থামতে সে বাধ্য হবেই। আর আমরা তখন আমাদের বিপদের কথাটা তাদের বুঝিয়ে বলে সেই গাড়িতেই চলে যেতে পারব বাকি পথটুকু।"

"দি আইডিয়া। তাই করো।"

ওরা আর কোনওরকম ভাবনা-চিন্তা না করে মোটর বাইকটাকে এনে রাস্তার মাঝখানে এমনভাবে শুইয়ে রাখল যে, আপ-ডাউনে যে-কোনও পরিবহণই আসুক না কেন থামতে তাকে হবেই।

ওদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল।

দ্রুতবেগে আসা লাল রঙের একটা মারুতি গাড়ি হঠাৎ ক্যাঁ-ক্যাঁচ করে ব্রেক কষল।

গাড়ির ভেতর থেকে এক সুন্দরী তরুণী তার বব করা চুল দুলিয়ে রীতিমত বিরক্ত হয়ে নেমে এসে বলল, "এইরকম কাজটা কার ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমার।"

"রাস্তার মাঝখানে এইভাবে এটা রাখে ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা এটাকে ইচ্ছে করেই রেখেছি দিদি। নিরুপায় হয়ে।"

"হঠাৎ এইরকম ইচ্ছের কারণ ?"

"আসলে আমাদের এই গাড়িটা আর চলছে না। হয় তেল নেই, না হলে কিছুর গোলমাল হয়ে খারাপ হয়ে গেছে। কখন থেকে চেষ্টা করছি হাত দেখিয়ে কোনও গাড়িকে থামাবার। কিন্তু কিছুতেই পারছি না। তাই বাধ্য হয়েই এ-কাজ করেছি।"

তরুণী একবার সন্দেহের চোখে ওদের দু'জনকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল, "তোমাদের সাহস তো কম নয়, এই বয়সের ছেলেমেয়ে তোমরা, এত রাত্রে মোটর বাইক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছ। তা বেরোবার আগে ভাল করে দ্যাখোওনি গাড়িতে তেল-টেল আছে কি না ? বাড়ি থেকে পালাচ্ছিলে বুঝি ?"

শুভঙ্কর বলল, "আপনার সন্দেহ ভুল।"

"তোমাদের মা-বাবাই বা কীরকম ? এইসব কমবয়সী ছেলেমেয়ের হাতে এইরকম একটা ভারী জিনিস তুলে দিয়েছেন ?"

মউ বলল, "আসলে এটা আমাদের নয়। অন্য একজনের জিনিস নিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

"স্ট্রেঞ্জ ! কী সাঙ্ঘাতিক তোমরা !"

"এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। বিশেষ প্রয়োজনে এক্ষুনি আমাদের গিধনিতে যেতে হবে। তাই এ-কাজ করেছি।"

"বুঝেছি। কিন্তু যাই করে থাকো না কেন, খুব অন্যায় করেছ। এখন এটাকে পথ থেকে সরাও, না হলে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

ততক্ষণে ডাউনে একটি মোটর এবং আগে একটি ট্রাক এসে থেমেছে।

শুভঙ্কর ও মউ পথের বাধা সেই মোটর বাইকটাকে ধরাধরি করে সরিয়ে রাখল এক পাশে।

ট্রাক ও মোটর উধাও হয়ে গেল।

মউ কাতর কণ্ঠে বলল, "আপনি কি অনুগ্রহ করে আপনার গাড়িতে আমাদের একটু লিফ্‌ট দেবেন ?" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

জনপ্রিয় হচ্ছে 'ক্যানো' প্রতিযোগিতা

শালতি বা ডোঙার মতো দেখতে এক ধরনের নৌকো হল 'ক্যানো'। এই নৌকো বাইচ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়।

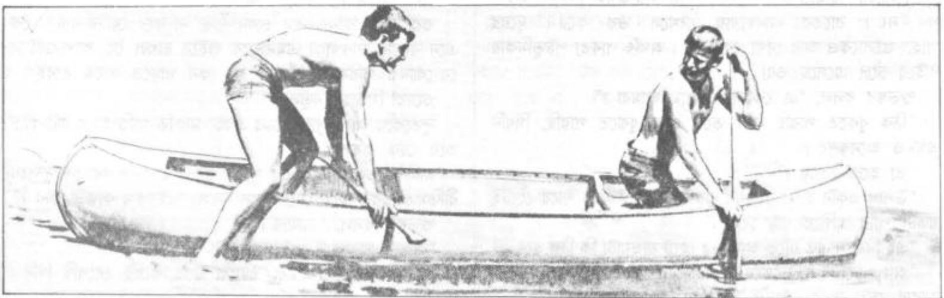

এই 'ক্যানো' নিয়েই হয়েছে অনেক বিখ্যাত অভিযান

আকারে ছোট, দু' দিকে ছুঁচলো দুটো মুখ, চলে প্যাড্‌ল্ বা পালের সাহায্যে। এই বিশেষ ধরনের নৌকোর নাম 'ক্যানো'। অনেকটা আমাদের শালতি বা ডোঙার মতো দেখতে। খেলা হিসেবে ক্যানো চালনা শুরু হয় ১৮৬৫ সালে, জন ম্যাকগ্রেগর পরিকল্পিত বিখ্যাত 'রব রয় ডেকড্ ক্যানো'র ব্যবহার আরম্ভ হওয়ার পর। এই ক্যানোর গায়ে মোড়া থাকত পাতলা কাঠের তক্তা, শক্ত করে আটকানো তামার আংটা দিয়ে। এর জনপ্রিয়তা বাড়াতে ম্যাকগ্রেগর বল্টিক দেশগুলির মধ্যে দিয়ে লম্বা সফর শুরু করলেন। সেই যাত্রা চলতে লাগল বল্টিক দেশের সীমানা ছাড়িয়ে জর্ডন এবং অন্যান্য দেশেও। ফিরে এসে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন রয়াল ক্যানো ক্লাব। তারপর তাঁর এই দারুণ অভিযানের কথা বর্ণনা করে একটি বই লিখলেন, 'আ থাউজেণ্ড মাইলস ইন দ্য রব রয় ক্যানো'। ম্যাকগ্রেগরের ক্যানোর কিছুদিন পরেই বেরোল ডব্লু ব্যাডেন-পাওয়েলের 'নটিলাস'। নটিলাস অবশ্য ছিল শুধু সাধারণ চলাফেরার জন্য। কোনও প্রতিযোগিতার কথা ভেবে এটা তৈরি হয়নি। ব্যাডেন পাওয়েলের অনেক বিখ্যাত অভিযানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুইডেন অভিযান। ১৮৯০-এর আগেই ক্যানোর চেহারায় আরও অনেক উন্নতি হল। বসল জল নিরোধক 'বাল্ক হেড', হাল আর হেলানো আসনের মতো উন্নত সাজ-সরঞ্জাম। ক্যানোকে তার আধুনিক রূপ দিল গ্রেট ব্রিটেন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই 'ইন্টারন্যাশনাল সেইলিং ক্যানো' তার আকারের তুলনায় প্রচণ্ড দ্রুতগামী। প্রতি বছর ক্যানো প্রতিযোগিতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ক্যানোর জনপ্রিয়তা দারুণ বেড়ে গেছে।

ক্যানোর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে শুরু করে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের মধ্যে। সেই সময় আবিষ্কৃত হয় 'ফোল্ডিং ক্যানো'। রবারের মতো ফেব্রিকের চামড়ায় মোড়া, অ্যাশ রডের তৈরি ভেতরের সরঞ্জাম আর ছোট-ছোট কাঠের টুকরো সমেত গোটা ক্যানোটাই বিশেষভাবে তৈরি হয় মুড়ে রাখার জন্য। এক আসন বা দুই আসন বিশিষ্ট ক্যানোর ওজন যথাক্রমে ৪০ এবং ৬০ পাউণ্ড। সুতরাং খুব সহজেই এদের বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় মাটির ওপর দিয়ে। মাত্র চার ইঞ্চি গভীর জল থাকলে তার ওপর দিয়েও এই ক্যানো চালানো যেতে পারে। সমস্ত ক্যানোটি খুলতে বা মুড়ে রাখতে সময় লাগে বড়জোর আধ ঘণ্টা। ককপিটকে ঘিরে রাখা স্প্রে-কভারটি চালককে জলের ছিটে থেকে বাঁচায়। এ ছাড়া ডেকের তলায় আটকানো থাকে হাওয়া-ফোলানো ব্যাগ। যদি কখনও ক্যানো উলটে যায় বা ডুবে যায় তা হলে তা আবার সোজা হয়ে উঠবে এর সাহায্যে। ছোট খাল বা নদীতে ছাড়াও ফোল্ডিং ক্যানো সমুদ্রে চালানোর পক্ষে সুবিধেজনক। আঘাত লাগলেও এর ভেঙে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। ফোল্ডিং ক্যানো চালিয়ে অনেকেই বহুবার পাড়ি দিয়েছেন ইংলিশ চ্যানেল। ফোল্ডিং ক্যানোর এক বিখ্যাত বিশেষজ্ঞের নাম মেজর র‍্যাভেন হার্ট। এই বিষয়ে তিনি অনেক বই লিখেছেন। 'ক্যানো ইন অস্ট্রেলিয়া', 'ক্যানো টু মান্দালয়' আর 'ক্যানো এরান্ট অন দ্য নাইল' বইগুলিতে পাওয়া যায় বহু চমকপ্রদ অভিযানের বিবরণ। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে তিনি ক্যানো চালিয়ে ভ্রমণ করেন প্রায় ২০,০০০ মাইল।

চলতি শতকেই প্যাড্‌ল্ চালিয়ে এবং পালের সাহায্যে দু'ভাবেই ক্যানো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ১৯৩৬ সালে ওলিম্পিকে প্রথম ক্যানোয়িং শুরু হল একটি নতুন খেলা হিসেবে। তারপর থেকে তা চলে আসছে নিয়মিতভাবে। প্রতিযোগিতার জন্য বিশেষভাবে তৈরি ক্যানোকে বলা হয় কায়াক। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় রীতিতে তৈরি এই কায়াকের মধ্যে থাকে একটি, দুটি বা চারটি আসন।

লণ্ডনের বার্ষিক সার্পেন্টাইন রেগাটায় এদের দেখা যায়। লম্বা দূরত্বের প্রতিযোগিতার জন্য স্পেনের আর্কানসাস নদীর নাম বিখ্যাত। এখানে যে-কোনও ধরনের ক্যানো নিয়ে যোগ দেওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া প্রতি ইস্টারে অনুষ্ঠিত হয় ওয়েস্ট মিনিস্টার রেস। এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে শুধুমাত্র দুই আসন বিশিষ্ট ক্যানো। স্কি স্লালোমের অনুকরণে ১৯৩৪ সালে শুরু হয় ক্যানো স্লালোম। খরস্রোতা নদীর ওপর টানটানভাবে টাঙানো দড়ি থেকে কিছু দূরেই ঝোলানো থাকে লম্বা লাঠি। ক্যানো-চালকদের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয় এভাবে। কে কত তাড়াতাড়ি এই বাধা কাটিয়ে পৌঁছতে পারে, এই নিয়েই প্রতিযোগিতা। সব সময়েই ক্যানো চালকদের সতর্ক থাকতে হয়।

প্রশ্ন

নিল ও'ব্রায়েন

(১) মানুষ একমাত্র কোন খাদ্য খেয়ে সারাজীবন বেঁচে থাকতে পারে ? **কিংশুক গুপ্ত**, ঝাড়গ্রাম ।
(২) পুরুষদের জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলসে জয়ী কোন ট্রোফি পান ? **সেখ আবদুর রব**, বেলুট, বর্ধমান ।
(৩) রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের 'ভান্ডারী' কাকে বলতেন ? **জলধর দত্ত, রমা সেন**, বেলডাঙা ।
(৪) কোন প্রাণীর পাখির মতো ঠোঁট, হাঁসের মতো জোড়া পা ও গায়ে পশুর মতো লোম আছে ? **সায়ন্তনী দাস**, বেহালা ।
(৫) প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান কে করেছেন ? **দিব্যেন্দু রায়**, কান্দি রাজ কলেজ ।
(৬) 'হর্ষচরিত' কার লেখা ? **অতনু হালদার ও চন্দন গোস্বামী**, রসুলপুর বি. এম. হাই স্কুল ।
(৭) 'হকির জাদুকর' কাকে বলা হত ? **সাওকি আলম**, সারগাছি আর. কে. এম. উচ্চ বিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ ।
(৮) 'তরুণের স্বপ্ন' বইটি কার লেখা ? **ইসমত তারা খাতুন, মধুমিতা ভড় ও সোমা অধিকারী**, বর্ধমান ।
(৯) গ্রিক সূর্যদেবতার নাম কী ? **সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত**, কলকাতা-৬ ।
(১০) নেলসন ম্যান্ডেলার পুরো নাম কী ? **উত্তম মোদক**, রসুলপুর ভুবনমোহন হাই স্কুল ।
(১১) 'নাইনটিন ফর এভার'—জো জ্যাকসন-এর এই গানটি কাকে নিয়ে লেখা ? **অমিত সরকার**, আসানসোল-২৫ ।
(১২) ১৯৮৯-এর নোবেল শান্তি পুরস্কার কাকে দেওয়া হয় ? **কমল সিওয়া**, হ্যামিল্টনগঞ্জ, জলপাইগুড়ি ।
(১৩) প্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন করেন কে ? **অতনু হালদার**, রসুলপুর ভুবনমোহন হাই স্কুল ।
(১৪) পিটার ব্রুক-এর মহাভারতে দ্রৌপদীর ভূমিকায় কে অভিনয় করেছেন ? **শুভস্মিত গোস্বামী**, রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি ।
(১৫) সুনীল গাওস্কর কার বলে কী ধরনের শট নিয়ে টেস্টে তাঁর দশ হাজার রান পূর্ণ করেন ? **অরিন্দম ব্যানার্জি**, লালগোলা ।
(১৬) মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল কোন নামে বেশি পরিচিত ? **অরূপরতন আইচ**, কোন্নগর ।
(১৭) হিরাকুঁদ বাঁধ কোথায় ? **অলোক কয়াল**, শিলিগুড়ি ।
(১৮) আয়তনে এশিয়ার বৃহত্তম দেশ কোন্‌টি ? **শিবাজি রায় ও সব্যসাচী দে**, বর্ধমান-৫১ ।
(১৯) 'জুলু' আদিবাসীদের কোথায় দেখতে পাওয়া যায় ? **সঞ্জয় মালাকার**, পলাশি ।
(২০) মাত্র একজন ব্যক্তিই পশ্চিমবঙ্গে দু'বার রাজ্যপাল হয়েছেন । তাঁর নাম কী ? **কুসুম সামন্ত**, বর্ধমান ।
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) নেপোলিয়ন ।
(২) North Atlantic Treaty Organisation.
(৩) ফোবস ও ডিমস ।
(৪) মেকিয়াভেলি ।
(৫) ডঃ অসীম দাশগুপ্ত ।
(৬) সঞ্জয় মঞ্জরেকর ।
(৭) কোপেনহেগেন ।
(৮) বনফুল ।
(৯) রণজিৎ সিংজি ।
(১০) উত্তরপ্রদেশের ফতেপুর ।
(১১) হল্যান্ডের মার্কো ভ্যান বাস্তেন ।
(১২) এ. সি. মিলান ।
(১৩) নিউ ওরলিনস (U.S.A.) ।
(১৪) কোরিয়া ।
(১৫) জন উইলস্ বুথ ।
(১৬) পঞ্জাব ।
(১৭) কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ।
(১৮) জেমস ওয়াট ।
(১৯) হাবিব তনবির ।

মার্কো ভ্যান বাস্তেন

হাবিব তনবির

জেমস ওয়াট

নেপোলিয়ন

বিষয় : আবোল তাবোল

প্রশ্ন

(১) গ্রীষ্মকালে কার গানের আওয়াজ দিল্লি থেকে বর্মা পর্যন্ত শোনা যায় ?
(২) কার খুড়ো আজব কল তৈরি করেছেন ?

(৩) কোন দেশের রাজা ছবির ফ্রেমে আমসত্ত্ব ভাজা বাঁধিয়ে রাখেন ?
(৪) 'গোঁফ চুরি' কবিতার বড়বাবু কোন অফিসে কাজ করতেন ?
(৫) গঙ্গারাম ক'বার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল ?

(৬) 'ট্যাঁশ্ গরু'-র খাদ্য কী ?
(৭) হুঁকোমুখো হ্যাংলা-র বাড়ি কোথায় ?
(৮) খেলার ছলে হাতি নিয়ে যখন তখন লোফালুফি করেন কে ?
(৯) 'বোম্বাগড়ের রাজার পিসী' কী দিয়ে ক্রিকেট খেলেন ?
(১০) গঙ্গারামের সবচেয়ে ছোট ভাই কী করে ?
(১১) এই দুনিয়ায় সবচেয়ে কী ভাল লাগে ?
(১২) শিবঠাকুরের দেশে পিছলে পড়লে কী শাস্তি হয় ?
(১৩) কে হয় ফাঁসি যাবে, নয় জেলে যাবে ?
(১৪) কাদের হাসতে বারণ ?
(১৫) যদি কুমড়ো পটাশ নাচে তবে কোন গাছে চড়বে ?
(১৬) বৃষ্টির পর আকাশ যে মিষ্টি সীতানাথ তা কেমন করে বুঝল ?
(১৭) গন্ধ বিচারের মামলায় কে পুরস্কার পেল ?
(১৮) কোন ছায়া সর্দি-কাশি সারিয়ে দেয় ?
(১৯) হাঁস ও সজারু মিলে কী জন্তু হয় ?
(২০) মুণ্ডু দেখার জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে ?

প্রশ্ন

(ক) সুকুমার রায়ের কোন কবিতার ছবি ?
(খ) ভূতের মা কী করছে ?
(গ) কে এই লোকটি ?
(ঘ) ইনি কী করেন ? ঐর নাম কী ?

(ক)

(খ)

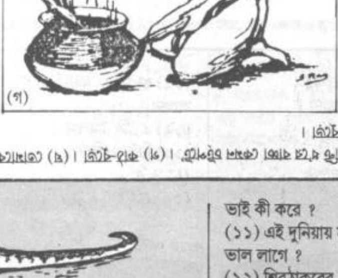
(গ)

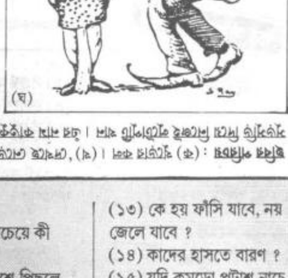
(ঘ)

ছবির পরিচয় : (ক) খুড়োর কল। (খ) 'দেখছে নেড়ে ঝুন্টি ধ'রে বাচ্চা কেমন চট্‌পটে'। (গ) কাঠ-বুড়ো। (ঘ) তোমাকে সুড়সুড়ি দিয়ে নিজেই লুটোপুটি খান। ঐর নাম কাতুকুতু-বুড়ো।

উত্তর : (১) ভীষ্মলোচন শর্মার। (২) চণ্ডীদাসের। (৩) বোম্বাগড়ের। (৪) 'হেড আফিসে'। (৫) উনিশটি বার। (৬) সাবানের সুপ আর মোমবাতি। (৭) বাংলা। (৮) 'ষষ্ঠিচরণ'। (৯) কুমড়ো দিয়ে। (১০) যাত্রাদলে সে তবলা বাজায়। (১১) 'পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়'। (১২) একুশ টাকা দণ্ড হয়। (১৩) ডানপিটে ছেলে। (১৪) রামগরুড়ের ছানা। (১৫) হট্টমূলার গাছে। (১৬) সে চেটে দেখেছিল। (১৭) বৃদ্ধ নাজির। (১৮) পেঁপে গাছের ছায়া। (১৯) হাঁসজারু। (২০) ফুটোস্কোপ।

ছোটদের ছড়া ও কবিতা

১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। দুটিই ছোটদের জন্য। ইংরেজি ভাষায় এ-পর্যন্ত যত ছড়া ও কবিতা লেখা হয়েছে ছোটদের কথা ভেবে, তারই নির্বাচিত সঙ্কলন। দুটি বইই সুন্দর। 'দি সঙ দ্যাট সিঙস দ্য বার্ড : পোয়েমস ফর ইয়ং চিলড্রেন' প্রকাশ করেছেন কলিন্স প্রকাশনা সংস্থা। সম্পাদক : রুথ ক্র্যাফট, ছবি এঁকেছেন জন ভারননলর্ড। সঙ্কলনটি নানা কারণে ভাল লাগে। কবিতার বাছাই যেমন ত্রুটিহীন, বিন্যাসও তেমনই প্রশংসনীয়। বইটির কয়েকটি ভাগ, যেমন, ওপেন দি ডোর, এ টাচ অব ওয়েদার, পুল দি আদার লেগ, ক্রিচারস—ইত্যাদি। সম্পাদক নিজে যে ছোটদের কবিতার উৎসাহী ও মগ্ন পাঠক তার প্রমাণ বইটিতে স্পষ্ট। অতীতের স্মরণীয় কবিদের মধ্যে কোলরিজ, ক্রিশ্চিয়ানা রসেটি, টেনিসন—এঁদের কবিতা যেমন আছে, আবার পাশাপাশি একদম আধুনিককালের নামকরা কবি কিট রাইট, রাসেল হোবান, ভারননস্ক্যানেল বা অলিভার ডাভও তাঁদের কবিতা নিয়ে হাজির। আছে বিচকুম্বার, বুনিয়ান, চেস্টারটন আর চার্লস এ ক্যারল-এর কবিতাও। একেবারে ছোটদের জন্য লেখা সহজ ছড়া থেকে শুরু করে কিশোর-কিশোরী বা একটু বড়দের মুগ্ধ করার মতো কবিতায় বইটি ভর্তি। দুষ্প্রাপ্য কয়েকটি কাব্যকাহিনীও আছে। ভারননলর্ডের সাদা-কালো ছবিগুলি বইটির বাড়তি আকর্ষণ। দাম : ৬·৯৫ পাউন্ড।

অন্য বইটির নাম 'এ পট অব গোল্ড'। সম্পাদক : জিল বেনেট। ডাবল-ডে প্রকাশনা, দাম : ৭·৯৫ পাউন্ড। বইটির ছবি এঁকেছেন প্যাডি মাউন্টার। এই বইটিরও কয়েকটি ভাগ রয়েছে। ভাগগুলি হল : ডায়মন্ডস, পারলস, এমেরাল্ডস ইত্যাদি। ছবিগুলি রঙিন। খুব ভাল লাগবে নানা অঞ্চলের লোভনীয় খাবার-দাবার নিয়ে লেখা অ্যাগনেস ম্যাক্সওয়েল হলের 'জামাইকা মার্কেট'। এডিথ সিটওয়েলের 'দি কিং অব চায়নাস ডটার'-ও নিঃসন্দেহে ছোটদের মন কাড়বে।

কল্পবিজ্ঞানের গল্প সঙ্কলন

ইংরেজি ভাষায় সায়েন্স-ফিকশন লেখা হচ্ছে বহুদিন ধরে। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে ছোটদের যত গল্পের বই প্রকাশিত হয় তার মধ্যে সায়েন্স-ফিকশন-এর বিক্রি সবচেয়ে বেশি। ইংরেজি সায়েন্স-ফিকশন লেখকদের মধ্যে আইজ্যাক আসিমভ এক স্বনামধন্য ব্যক্তি। বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক ধারার জন্মদাতা। তাঁর এই

'দি সঙ দ্যাট সিঙস দ্য বার্ড : পোয়েমস ফর ইয়ং চিলড্রেন' বইয়ে জন ভার্নন লর্ডসের আঁকা ইলাস্ট্রেশন

অবিস্মরণীয় অবদানের কথা মনে রেখে সম্প্রতি একটি সায়েন্স-ফিকশন সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। নাম 'ফাউন্ডেশনস ফ্রেন্ডস', অনেক দারুণ-দারুণ গল্প আছে বইটিতে। তার মধ্যে রবার্ট শেকলি-র লেখা দুটি রোবটের কাহিনী মনে রাখবার মতো। রোবট দুটি প্রথম দিকে খুব বাধ্য ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন তারা বিদ্রোহ করল, মেতে উঠল ধ্বংসলীলায়। তাদের যে কী করে সামলানো যাবে সে-কথা ভেবে-ভেবেই বিজ্ঞানীরা দিশেহারা!

এ ছাড়া, ফ্রেড পোলের 'দি রিইউনিয়ন অ্যাট দি মাইল হাই'-ও বেশ উপভোগ্য কাহিনী। আর যাঁরা বইটিতে লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন : রে ব্র্যাডবেরি, জর্জ এফিনগার, ব্যারি ম্যালসবার্গ প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিক। সম্পাদনা করেছেন মার্টিন এইচ গ্রিন। প্রকাশক : টর পাবলিশার্স। দাম : ১৯·৯৫ ডলার।

অভীক মজুমদার

তিনরকমের তিনটি বই

ফুটবল কুইজ
হান্নান আহসান, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী
ডেল্টা ফার্মা, কলকাতা-৬
দাম : ১২ টাকা

আশি পৃষ্ঠার এই বইয়ে ফুটবলের বিভিন্ন তথ্যগত প্রশ্নোত্তর রয়েছে। আন্তর্জাতিক ফুটবলের পাশাপাশি এসেছে দেশীয় ফুটবলের নানান সালতামামি। তবে, কলকাতার তিন প্রধান দল ছাড়া অন্য দলগুলির কথা এখানে নেই।

প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
রণতোষ চক্রবর্তী
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ.
কলকাতা-৬
দাম : ১৫ টাকা

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম প্রবাদতুল্য। গোপালচন্দ্রের ব্যক্তি-জীবন এবং বিজ্ঞানচর্চার কথা সাবলীলভাবে বর্ণিত হয়েছে। গোপালচন্দ্রের গ্রন্থতালিকা এ বইয়ের বিশিষ্ট সংযোজন। যদিও তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়।

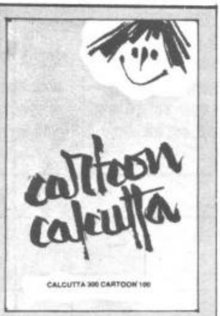

কার্টুন ক্যালকাটা
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপ মিত্র, সুপর্ণ আচার্য সঙ্কলিত
কিঞ্জল প্রকাশন
কলকাতা-১৪
দাম : ১২ টাকা

কলকাতার তিনশো বছর উপলক্ষে নানা বই প্রকাশিত হচ্ছে। কার্টুন ক্যালকাটা অবশ্যই তার মধ্যে অন্যরকম। বিশিষ্ট কার্টুনিস্টদের ছবির মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে অন্য এক কলকাতার ছবি।

গৌতম ঘোষদস্তিদার

ধাঁধা

এই রবিবারটা বেশ আনন্দে কাটল। সকাল থেকে হইচই। পাড়ার যত ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে, সবাই নাম লিখিয়েছিল বসে-আঁকো প্রতিযোগিতায়। আমাদের বড় পার্কটাও সেদিন মনে হচ্ছিল ছোট্ট হয়ে গেছে। হবে নাই বা কেন, গুনে-গুনে একশোজন প্রতিযোগী লাইন করে বসে গিয়েছিল রং-তুলি আর কাগজ নিয়ে। তার মধ্যে উদ্যোক্তারা ঘুরে-ঘুরে তদারকি করছে। দর্শকদের ভিড়ও দেখার মতো। একে তো অভিভাবকদের ভিড়, তার উপর রয়েছে পথ-চলতি দর্শক। মূল প্রতিযোগিতা চলেছিল দেড় ঘণ্টা ধরে। সেই সময়টুকুতে অবশ্য বাইরের লোকেদের মাঠে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু প্রতিযোগিতা শেষ হতেই

মাঠ একেবারে কানায়-কানায় ভরে গেছে। দু' ঘণ্টা সময় ছাড় দেওয়া হয়েছিল স্নান-খাওয়ার জন্য। সেই অবসরে উদ্যোক্তারা ছবিগুলোকে মাঠ ভরে টাঙাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন। দুপুর দুটো থেকে সন্ধে পর্যন্ত ছবিগুলো দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সন্ধের পর পুরস্কার বিতরণ। একটা ব্যাপার খুব ভাল হয়েছিল। প্রত্যেক প্রতিযোগীই কিছু-না-কিছু পুরস্কার পেয়েছে। তবে হ্যাঁ, সবাই কি আর একই রকম দামি উপহার পেয়েছে? তা নিশ্চিত নয়। তবু, বড় কথা হল, সবাই পেয়েছে এবং ছোট্টরা দারুণ খুশি—কিছু-না-কিছু উপহার পেয়ে। বিচারকদের মধ্যে ছোট্কা যেমন ছিল, পরামর্শদাতা হিসেবেও ছোট্কা এই প্রতিযোগিতার শুরু থেকে অনেক বুদ্ধি জুগিয়েছে। ছোট্কার কাছেই শুনতে পেলাম কী-ধরনের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অবশ্য ছোট্কা কথাটা সহজভাবে ভাঙেনি।

বলেছে কিছুটা—কিছুটাই বা কেন, বলা উচিত সবটাই—ধাঁধা করে। সেই ধাঁধাটাই বলছি এবার।

প্রথম ধাঁধা ॥ বসে-আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার কেনা হয়েছে পঞ্চাশ টাকার। পঞ্চাশ টাকায় একশোটা পুরস্কার। তিনরকম মিলিয়ে একশোটা। রঙের বাক্স পাঁচ টাকা করে। তুলির দাম এক টাকা করে। রঙিন মোম-পেনসিল এক-একটা দশ পয়সা। পুরস্কারে রঙের বাক্স ছিল, তুলি ছিল, আর ছিল মোম-পেনসিল। এবার বলো তো, পঞ্চাশ টাকায় একশোটি পুরস্কার দিতে হলে, কোন্টা কত কেনা হবে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ পথ মাটিতে থাকে না, থাকে আকাশে?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

ভাতিগবক

গতবারের উত্তর ॥ (১) ৮, ১২, ৫ ও ২০—এইভাবে চারভাগ হবে পঁয়তাল্লিশ টাকা। তা হলে, শর্তানুযায়ী, প্রতিক্ষেত্রে উত্তর হবে ১০। (২) দ্বিতীয় ঘড়িটা, যেটা বন্ধ হয়ে আছে। দিনে-রাতে দু' বার তো ঠিক সময় দেখাবে! (৩) মুসাফিরখানা।

সত্যসন্ধ

কত কথা

তিন অক্ষরের এমন একটি ফুলের নাম করো তো যার শেষে রয়েছে একটি ফল?

২। এবারে তোমাদের সেই অতি প্রিয় শব্দের খেলা। তিন জোড়া শব্দসূত্র দেওয়া হল। প্রতি জোড়ার প্রথম সূত্র অনুযায়ী যে-শব্দ পাবে, দ্বিতীয় সূত্রে সেই শব্দটিরই অক্ষর উলটে-পালটে অন্য শব্দ তৈরির আভাস দেওয়া থাকল। (ক) মধ্যভারতের প্রাচীন দেশবিশেষ/চোরাই মালপত্রসহ। (খ) ভারতে মুঘলশাসনের প্রবর্তক/বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (গ) সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য বা প্রয়োজনীয় উপকরণ/জেলার প্রধান নগর।

৩। কোন্ কোন্ তারার আলো নেই?

উত্তর : ১। বকুল (শেষের দু' অক্ষরে কুল)। ২। (ক) মালব/বমাল। (খ) বাবর/রবাব। (গ) রসদ/সদর। ৩। একতারা, দোতারা।

কথক

মজার খেলা

এবারের মজার খেলার উপকরণ অতি সামান্য। কাগজ আর পেনসিল। অথচ মজাটা কম নয়। যেমন মজাদার, তেমনই বুদ্ধিদীপ্ত। তবে হ্যাঁ, এ-খেলা একলা খেলার নয়। বন্ধুবান্ধব চাই। বন্ধুদের সামনে তুলে ধরতে হবে সমস্যা। সমাধান করতে গিয়ে তারা যত হিমশিম হবে, খেলার মজা তত বাড়বে।

তার আগে বলি সমস্যাটার কথা। নীচের ছবিটা দেখে রাখো ভাল করে। এই ছবিটাই হুবহু আঁকতে হবে বন্ধুদের সামনে।

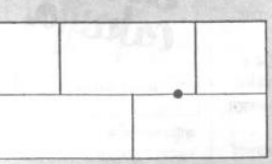

ছবিটা বন্ধুদের দেখাও। তারপর বলো, কী করতে হবে। করতে হবে কী, বিন্দুচিহ্ন থেকে শুরু করে অবিচ্ছিন্ন একটা রেখা টেনে যেতে হবে। এমনভাবে টানবে সেই রেখা, যাতে কি না প্রতিটি লাইনের কোনও-না-কোনও অংশ ঠিক একবার করে পেরিয়ে যায় রেখাটি।

শুনতে সহজ। কিন্তু চট করে যে সমাধান হওয়ার নয়, সেটা বুঝতে পারবে সমস্যাটার উত্তর খুঁজতে গেলে। আর সহজ নয় বলেই বন্ধুরা নাকাল হবে। আর নাকাল হবে বলেই মজা।

কিন্তু তার আগে একটা কথা বলো তো। তোমরা নিজেরা কি পেরেছ? পারোনি? তা হলে বন্ধুদের বোকা বানিয়ে নিজেও যে বোকা বনে যাবে! আমার কিন্তু সমাধান হয়ে গেছে। কীভাবে, নীচের ছবিতে দ্যাখো। উত্তরে একটু চালাকি রয়েছে অবশ্য। একটা লাইনের উপর দিয়ে দাগ টেনে গিয়ে ফের সেই লাইনকে পেরিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু, লাইনে যে ছাপা বুলনো চলবে না, একথা বলা ছিল না। তাই, উত্তরে ভুল হচ্ছে না। ভুল বলাটাই ভুল হবে।

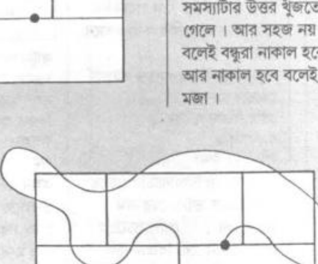

মজারু

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

মামণি বলো একটা ২০০ গ্রাম সিবাকার প্যাকেট নিয়ে আসতে। ভেতরে দারুণ সুন্দর একটা ছোট্ট জানোয়ার পাবে।

Trikaya Grey HCG 7.90 BEN

ANANDAMELA 4 APRIL 1990 REGD NO
WB/CC 264 MH BY SOUTH 683 TN MS(C) 731